e-ISSN .....
ISSN .....

জৈন সংস্কৃতি | 𑀚𑁃𑀦 𑀲𑀁𑀲𑁆𑀓𑁃𑀢𑀺

JAIN SAMSKRITI

QUARTERLY DECEMBER 2025

Bengali & English

VOLUME 1, ISSUE 1

জৈন সংস্কৃতি | JAIN SAMSKRITI

ত্রৈমাসিক দ্বিভাষিক পত্রিকা (বাংলা ও ইংরেজি)

প্রথম বর্ষ **প্রথম সংখ্যা** **ডিসেম্বর ২০২৫** **অগ্রহায়ণ ১৪৩২**

জৈন ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প ও সমাজচিন্তা বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্রিকা। মৌলিক প্রবন্ধ, গবেষণা-নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা ও প্রামাণ্য লেখা বাংলা ও ইংরেজি—উভয় ভাষায় প্রকাশিত।

সম্পাদক

সুখময় মাজী

প্রকাশক

বঙ্গীয় জৈন সংস্কৃতি পরিষদ

সম্পাদকীয় দপ্তর

গ্রাম ও ডাকঘর: গঙ্গাজলঘাটী

জেলা: বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন: ৭২২১৩৩

যোগাযোগ (ই-মেইল): joyhind.joybharat@gmail.com

© বঙ্গীয় জৈন সংস্কৃতি পরিষদ

এই পত্রিকার কোনো লেখা বা তার অংশ পুনর্মুদ্রণ করতে হলে সম্পাদকীয় দপ্তরের অনুমতি আবশ্যক।

জৈন সংস্কৃতি | JAIN SAMSKRITI | 𑀚𑁃𑀦 𑀲𑀁𑀲𑁆𑀓𑁃𑀢𑀺

ত্রৈমাসিক দ্বিভাষিক পত্রিকা (বাংলা ও ইংরেজি)

প্রথম বর্ষ **প্রথম সংখ্যা** **ডিসেম্বর ২০২৫** **অগ্রহায়ণ ১৪৩২**

ISSN .....

সূচিপত্র

১.	মূর্তিশিল্পে বর্ধমানের জৈন পরম্পরা	সঞ্জীব চক্রবর্ত্তী	২
২.	The place of Women in Jainism	Sanchita GhoSh	১৫
৩.	প্রাচীন ঐতিহ্য সৌন্দর্যের গর্বে আজও গর্বিত সরাক সমাজ	অরুণকুমার মাজি	২১
৪.	বাঁকুড়া ইন্দপুর পরিমণ্ডলে কয়েকটি জৈন প্রত্নস্থল	সুমিত মহন্ত	৩২
৫.	রাজা শ্রেণিক ও রানি চেলনার কথা	সুখময় মাজি	৪১

© বঙ্গীয় জৈন সংস্কৃতি পরিষদ

এই পত্রিকার কোনো লেখা বা তার অংশ পুনর্মুদ্রণ করতে হলে সম্পাদকীয় দপ্তরের অনুমতি আবশ্যক।

সম্পাদকীয়

জয় জিনেন্দ্র। নতুন পথচলার এই মুহূর্তে বঙ্গীয় জৈন সংস্কৃতি পরিষদের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। জৈন ধর্ম ও সংস্কৃতির নানা দিক, তার ইতিহাস, সাহিত্য, নৈতিক দর্শন, আধ্যাত্মিক অনুশীলন, এবং আধুনিক সমাজে তার প্রয়োগ—এসব বিষয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বাংলাভাষায় একটি সার্বজনীন আলোচনার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। আমাদের এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা সেই প্রয়োজন পূরণের এক ক্ষুদ্র প্রয়াস।

এই পত্রিকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো–এখানে লেখকের পূর্ণ স্বাধীনতা রক্ষা করা হবে। আমরা বিশ্বাস করি, সত্য ও মুক্ত চিন্তাই জ্ঞানচর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তাই নিতান্ত প্রয়োজন না হলে কোনো লেখায় সম্পাদকীয় হস্তক্ষেপ করা হবে না। জৈন দর্শনের অনেকান্তবাদ—বহুমাত্রিক সত্য—নীতির আলোকে আমরা মতের বৈচিত্র্যকে স্বাগত জানাই। ফলে কখনো কখনো কোনো বিষয় বা মতবয়ানে বিতর্ক সৃষ্টি হতে পারে; তবে সে বিতর্ক যেন থাকে ভদ্র, পরিশীলিত ও যুক্তিনিষ্ঠ—এই প্রত্যাশা সকলের কাছে।

যদি কোনো পাঠক কোনো লেখার তথ্য বা বক্তব্য নিয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন, তবে তিনি সংযত ভাষায় সম্পাদকীয় দপ্তরে পত্র বা ই-মেল পাঠাতে পারেন। আমরা তাঁর বক্তব্য যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করব এবং প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট লেখকের প্রতিক্রিয়াসহ সেই আলোচনা পত্রিকার পরবর্তী কোনো এক সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে। এতে পাঠকমহলে মতবিনিময়ের যে সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি হবে, তা-ই আমাদের প্রকৃত সাফল্য।

এই পত্রিকা দ্বিভাষিক—বাংলা এবং ইংরেজি—দুই ভাষাতেই প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, স্মৃতিকথা, গবেষণা-নিবন্ধ প্রভৃতি নিয়মিত প্রকাশিত হবে। তবে প্রতিটি লেখাই জৈন ধর্ম, সংস্কৃতি, দর্শন বা জৈন নৈতিকতা-সম্পর্কিত হতে হবে। আমরা চাই, নবীন ও প্রবীণ—দুই প্রজন্মের লেখকেরা তাঁদের ভাবনা ও সৃজনশীলতা এই পত্রিকার মাধ্যমে তুলে ধরুন।

আমাদের লক্ষ্য কোনো সীমাবদ্ধ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকা নয়; বরং জৈন ঐতিহ্যের আলোয় সমকালীন মানবসমাজকে নতুনভাবে ভাবার পথ উন্মুক্ত করা। এই যাত্রায় আপনাদের সহযোগিতা, উৎসাহ ও সদ্ভাব আমাদের সবচেয়ে বড় প্রেরণা। আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা—
আমাদের এই পথচলা শুরু হোক শান্তি, সহমর্মিতা ও সত্য-অন্বেষার আলোয়।

সম্পাদক

মূর্তিশিল্পে বর্ধমানের জৈন পরম্পরা

- সঞ্জীব চক্রবর্ত্তী

অসীম প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং সম্পদের মধ্যে ভারতের সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে যুগ যুগ ধরে, নানা রূপে। লোকায়ত সমাজ প্রকৃতির সম্পদ আহরণ করে জীবনধারণ করে গেছে; রোগপীড়া আপদবালাই দূরে রাখার উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছে যক্ষ, ভূত, প্রেত, গ্রামদেবতা, মাতৃকাদের জগৎ। বৈদিক ঋষিরাও এক সময় যজ্ঞকর্মের মাধ্যমে বলি ও আহুতি প্রদান করে নানা পার্থিব চাহিদা মেটাবার চেষ্টা করে গেছেন। তবু ক্রমে ক্রমে দৃশ্যমান জগতের বাইরে থাকা বৃহত্তর ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে। বিশ্ব ও জীবন সম্পর্কে দার্শনিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে উপনিষদে। সে-ভাবনা জীবনের দুঃখকষ্ট সত্ত্বেও আনন্দের সন্ধান দেয়। তাঁদের প্রভাব ছিল আর্যাবর্ত ও মধ্যদেশ জুড়ে, যার সীমা সদানীরা বা ঘর্ঘরা নদীর পশ্চিম কূল পর্যন্ত।

সদানীরা নদীর পূর্বে বৃহত্তর মগধ দেশ, যেখানে জীবনধারা, সংস্কৃতি ও দর্শনের ধারা ভিন্ন চরিত্রের। এখানেই জন্ম নেয় মানব-অস্তিত্বের চরিত্র, সুখদুঃখের কারণ, কর্মফল এবং জন্মান্তরবাদের নানা সূক্ষ্ম তত্ত্ব। আত্মজ্ঞানের সন্ধানে ব্রতী তাঁরা কর্মফল, পুনর্জন্ম, জন্মমৃত্যুর চক্র থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে গেছেন নানাভাবে। কালক্রমে উপনিষদের নিষ্কাম কর্ম, গৌতম বুদ্ধের তৃষ্ণাজয়ের জন্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের চর্চা এবং জৈন সন্তদের কর্মফলে আবদ্ধ অস্তিত্বকে পুদগল-মুক্ত করতে সাংসারিক ক্রোধ, দ্বেষ-ত্যাগী সংযম ও চারিত্রমার্গ চর্চার ত্রিবেণীসঙ্গম ঘটেছিল পরম জ্ঞানে। জিজ্ঞাসুর চিত্তে উপনিষদ, ত্রিপিটক এবং শ্রুতশাস্ত্রে প্রায় একই প্রকার অনুভূতির প্রকাশ ঘটল। পরম সত্তার চরিত্র নিজের মত করে প্রকাশিত হল প্রথম জৈন আগম গ্রন্থ আচারঙ্গ সূত্রে -

"(সেই মুক্ত পুরুষ) দীর্ঘও নহে, হ্রস্বও নহে, বর্তুল, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ বা বৃত্তাকারও নহে। সে কৃষ্ণ, নীল, লোহিত, পীত বা শুক্লবর্ণও নহে, সে সুগন্ধি বা দুর্গন্ধীও নহে। সে তিক্ত, কটু, কষায়, অম্ল বা মধুরও নহে, সে কর্কশ, কোমল, গুরু, লঘু, শীতল, উষ্ণ, স্নিগ্ধ বা রুক্ষও নহে, তাহার শরীরও নাই, পুনর্জন্মও হয় না, সে সম্বন্ধিতও হয় না, সে স্ত্রী, পুরুষ বা নপুংসকও নহে। সে জ্ঞাতা, সে দ্রষ্টা। কোন উপমান দ্বারা তাহাকে জানা যায় না, তাহার অস্তিত্ব আছে অথচ সে নিরাকার, নিরুপাধিক, তাহার কোন উপাধি নাই, সে শব্দ, রূপ, গন্ধ, রস বা স্পর্শও নহে, এই সকলের মধ্যে সে কিছুই নহে – ইহাই আমি বলিতেছি।"

কত প্রাচীন এই জিনধর্মের ধারা? অবশ্যই মানুষের স্বাধীন চিন্তার যতখানি বয়স ততটাই। এটি হয়তো কোনো নতুন ধর্মমত নয়, মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসার এক প্রকাশ। জৈনধর্মে এক-একটি কল্প নামে অভিহিত হয়। কালচক্রের দুটি ভাগ, যথা উৎসর্পিণী এবং অবসর্পিণী। গুণগত আরোহণের যুগ হল উৎসর্পিণী কাল। এই পুণ্যের পর্বে যে চতুর্বিংশতি জন তীর্থঙ্কর আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁরা হলেন - প্রথম কেবল জ্ঞানী, দ্বিতীয় নির্বাণী, তৃতীয় সাগর, চতুর্থ মহাযশ, পঞ্চম বিমলনাথ, ষষ্ঠ সর্বানুভূতি, সপ্তম শ্রীধর, অষ্টম দত্ত, নবম দামোদর, দশম সুতেজ, একাদশ স্বামী, দ্বাদশ মুনিসুব্রত, ত্রয়োদশ সুমতি, চতুর্দশ শিবগতি, পঞ্চদশ অস্তাগ, ষোড়শ নেমীশ্বর, সপ্তদশ অনিল, অষ্টাদশ যশোধর, উনবিংশ কৃতার্থ, বিংশতি জিনেশ্বর, একবিংশতি শুদ্ধমতি, দ্বাবিংশতি শিবকর, ত্রয়োবিংশতি স্যন্দন (স্পন্দনপ্রভ?) এবং চতুর্বিংশতি সংপ্রতি।

বর্তমানে অবসর্পিণী কাল চলছে, যে সময় হল ক্রমিক গুণগত পতনের যুগ। এই অবসর্পিণীতেও ২৪ জন তীর্থঙ্কর অবতীর্ণ হয়েছিলেন। জৈনদের প্রাচীনতম সিদ্ধান্ত একাদশ অঙ্গের অন্তর্গত সমবায়াঙ্গে ২৪ জন তীর্থঙ্করের বিবরণ পাওয়া গেল। তীর্থঙ্করদেরই অপর নাম জিন। এই জিন কারা? দানান্তরায়, লাভান্তরায়, বীর্যান্তরায়, ভোগান্তরায়, উপভোগান্তরায়, পদার্থে প্রীতি, অরতি, সপ্ত প্রকার ভয়, ঘৃণা, শোক, কাম, দর্শন মোহ, অজ্ঞান, নিদ্রা, অবিরতি, রাগ ও দ্বেষ - এই আঠারো প্রকার দোষ যাঁর নেই, সেইরূপ ব্যক্তিই জিনপদবাচ্য। অর্হন, জিন, পরমেশ্বর, ভগবান ইত্যাদি তাঁর বহুবিধ নাম। এই অষ্টাদশ দোশের মধ্যে কোনো একটিও দোষ থাকলে তিনি জিন বা তীর্থঙ্কর হতে পারেন না।

ইতিহাসের যুগে দেখা যায় সদ্ধর্মালংকার প্রভৃতি পালিগ্রন্থে বুদ্ধদেবের সমসাময়িক ছয়জন তীর্থিকের উল্লেখ আছে। এই ছয়জনের নাম পূর্ণকাশ্যপ, মংখলিপুত্ত গোসাল, ককুদকাত্যায়ন, অজিত কেশকম্বল, সঞ্জয়পুত্রবৈরতি, এবং নিগ্গণ্ঠনাতপুত্ত। তাঁরা প্রত্যেকেই যজ্ঞগৃহের অঙ্গনের বাইরে এসে জীবনের অর্থ এবং কর্মফলের বন্ধন কাটাবার পন্থা অন্বেষণ করে গেছেন। শেষোক্ত নিগ্গণ্ঠনাতপুত্ত এক ধর্মমত প্রবর্তক বলে বর্ণিত হয়েছেন। নাথপুত্র বা জ্ঞাতপুত্র শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামীরই নামান্তর।

আচারাঙ্গের প্রসিদ্ধ টীকাকার শীলাঙ্ক লিখেছেন, ২৩তম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ যে ধর্মমত প্রচার করেন, তাই চতুর্যামধর্ম এবং ২৪তম এবং শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীর স্বামী যে ধর্মমত প্রবর্তন করেন

তাই পঞ্চযাম বা পঞ্চ মহাব্রত পালনরূপ ধর্ম। আসলে পার্শ্বনাথের চাতুর্যাম ধর্মের পরিগ্রহ ব্রত থেকে ব্রহ্মচর্য ব্রতকে পৃথক করে মহাবীরের পঞ্চযাম ধর্মের সৃষ্টি হয়।

চরম নিরাকারবাদীও স্বীকার করবেন যে অব্যক্ত অবাঙ্মনসগোচরকেও প্রকাশ করতে গেলে তাকে কিছু শব্দবন্ধে বা সংজ্ঞায় বাঁধতে হয়। সাধারণ মানুষ তার মনের তৃপ্তির জন্য আরো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আধার খোঁজে। বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে মার্কণ্ডেয় বললেন যে কৃত অর্থাৎ সত্য, ত্রেতা এবং দ্বাপর যুগে ছিল অন্তর্বেদী পূজা। কলিযুগে প্রচলিত হ'ল বহির্বেদী পূজা অর্থাৎ দেবালয় এবং দেবমূর্তিনির্মাণ, উৎসব-উদ্‌যাপন, নৃত্যগীতাদি, নানা আচারঅনুষ্ঠানের মাধ্যমে উপাসনা। এই ভনিতাটুকু প্রয়োজন হল এই কারণে যে, জিনধর্ম বা জৈনধর্ম সৎচিন্তা, সৎকর্ম, সদাচরণ প্রভৃতিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে, কিন্তু সাধারণের জন্য মূর্তি-রচনার অংশটুকু একেবারে বাদ দিতে পারেনি। পৌরাণিক এবং বৌদ্ধধারার মতই তারাও মূর্তি রচনার পথ নেয় এবং সেই মূর্তিলক্ষণ বিধিবদ্ধ হয় শিল্পশাস্ত্রসমূহে।

মূর্তি-রচনার প্রত্যক্ষ প্রমাণের মধ্যে আছে হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি নগ্ন পুরুষমূর্তি এবং সিলমোহরে একটি যোগীমূর্তি। এগুলিকে অনেকে জৈনধর্মের আদি নিদর্শন বলে অনুমান করেন। কুষাণ যুগে বিধিবদ্ধ মূর্তির আকারে উপাসনা শুরু হয়। মথুরার কঙ্কালী টিলা প্রত্নক্ষেত্রে অনেক প্রাচীন জৈনমূর্তি ও আয়োগপট্টের সন্ধান মিলল। পুরাণের যুগে যখন বৌদ্ধ এবং বৈদিক উভয় ধারাই নানা লোকায়ত গ্রামদেবতা ও তান্ত্রিক দেবদেবীকে আত্মস্থ করে নিজস্ব দেবায়তন গড়ে তুলছে, তখন জৈনরাও সাধারণ স্রোতের বাইরে থাকেননি। সকলেই একই লোকায়ত এবং জনপ্রিয় উৎস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন। ফলে বেশ কয়েকজন সাধারণ দেবদেবীর দেখা সব ধারাতেই মেলে এবং তাঁরা নিজ গুণানুসারে মাহাত্ম্য অর্জন করেছেন। তবে তাঁদের মর্যাদার পার্থক্য অবশ্যই অগ্রাহ্য করা যাবে না।

মনে রাখতে হবে যে মূলত লোকদেবতা ও ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক দেবলোক থেকে গৃহীত দেবদেবীরা তীর্থঙ্করদের তুলনায় গৌণস্থানের অধিকারী এবং তাঁদের অনুগত সেবক-রূপে গৃহীত হন। কেননা তাঁরা তীর্থঙ্করদের মত রাগ, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি সাংসারিক প্রবৃত্তি জয় করতে পারেননি। জৈনদিগের যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে স্ত্রী, অস্ত্রশস্ত্র ও অক্ষমালাদি চিহ্নে ভূষিত, নিগ্রহ ও অনুগ্রহপরায়ণ, শান্তপদ অতিক্রম করে নৃত্য গীত অট্টহাস উপপ্লবাদি দোষে দুষ্ট থাকা জীবের

মুক্তি সম্ভব নয়। অথবা যারা স্ত্রীসঙ্গ, কাম, দ্বেষ, আয়ুধ, অক্ষসূত্রাদি, অশৌচ ও কমণ্ডলুধারণ করে, তারাই কুদেব। এরূপ কুদেবকে পরমেশ্বর বা ভগবান বলা যেতে পারে না। এইজন্য হিন্দুদেবদেবী জৈন সমাজে কুদেব মধ্যে গণ্য। অবশ্য তাঁদের জন্য শাস্ত্রবিহিত পূজার অভাব হয় না। শ্বেতাম্বর আচার্যগণের মতে বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, মীমাংসক, চার্বাক প্রভৃতি কুগুরুর মত।

বৌদ্ধগণ বিরুদ্ধবাদীদের তীর্থ্য বা তীর্থিক নামে উল্লেখ করতেন। তাঁরা প্রায়ই তীর্থিকদের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের পরাস্ত করার চেষ্টা করতেন। প্রতিপক্ষ যে সবসময় ব্রাহ্মণ হতেন, তা নয়। তাঁদের মধ্যে পূর্বে উল্লিখিত আচার্যগণের সকলেই ছিলেন। এক্ষেত্রে সমালোচক বৌদ্ধদের কাছে সম্ভবত ব্রাহ্মণ ও তীর্থঙ্কর প্রায় সমার্থক হয়ে উঠেছিল। বৌধায়ন-উক্ত নীতি ও যজুর্বেদের 'মা হিংসীঃ পুরুষং জগৎ' এই মূল মন্ত্রের সঙ্গে জৈনধর্মের অহিংসার নীতির চরিত্রগত্র সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। যে-সময়ে নিরগ্নিক ঔপনিষদিক ভাবনা সবে আকার নিতে শুরু করেছে সে-সময়ে আর্যাবর্তের ধর্মচর্চার মূলস্রোতে যাগযজ্ঞাদিতে পশুবধ প্রথা বিশেষ প্রবল ছিল। সেই সময় কোনো কোনো মহাপুরুষ দয়ার্দ্র হয়ে হিংসা নিবারণার্থে অভিনব ধর্ম প্রচারে অগ্রসর হয়েছিলেন যাতে চারি বর্ণই যোগদান করেছিলেন। অহিংসা প্রচারকগণ আবির্ভূত হ'লে বেদমার্গাবলম্বী ব্যক্তিগণ তাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলেন। তাঁদের সম্পর্কে নাস্তিক, ধর্মত্যাগী প্রভৃতি নিন্দাসূচক শব্দ ব্যবহৃত হতে লাগল। যজ্ঞগৃহের বাইরে কিন্তু নিরগ্নিক জ্ঞানচর্চার আদানপ্রদানের পথ কিন্তু তাতে রুদ্ধ হল না। মিলনাত্মক যৌথ সাধনায় সমৃদ্ধ হ'ল ভারতীয় ধর্ম, দর্শন এবং সংস্কৃতি।

অহিংসাধর্ম প্রচারক জৈনরা পশুহিংসা-প্রধান যাগযজ্ঞ পরিহার করলেন বটে, কিন্তু মৌলিক সামাজিক রীতিনীতি আচার ব্যবহার ও পূর্বপালিত অপর ধর্মশাস্ত্রাদি, পূর্ব-পূজিত কোনো-কোনো দেবদেবীকে পরিত্যাগ করেননি। জৈন শাস্ত্রকারগণ ব্রাহ্মণদের মতোই অঙ্গ উপাঙ্গ আগম ও পুরাণাদি প্রচার করে গেছেন। জৈনরা বর্ষাকালে চাতুর্মাস পালন করেন; এই চারমাস তাঁরা বিহার করেন না, যাতে এই সময় অত্যধিক হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত কীটপতঙ্গাদি ক্ষুদ্র জীব তাঁদের পায়ের তলায় পিষ্ট না হয়।

জিনমূর্তি

বিভিন্ন শিল্পশাস্ত্রে ব্রাহ্মণ্যধারার দেবদেবী নির্মাণের মতোই জিনমূর্তির কিছু সাধারণ লক্ষণ

বিহিত আছে। স্মরণে রাখতে হবে যে সাধারণত একই শিল্পীগোষ্ঠী ভক্তের চাহিদা মতো মূর্তি নির্মাণ করে দিতেন। জিনমূর্তি রচিত হবে পদ্মাসনে আসীন অথবা খড়্গাসনে বা কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান আকারে। জিনমূর্তি হবে সুরূপ। কুরূপ বিগ্রহ যেহেতু ভক্তির উদ্রেক ঘটায় না তাই ভারতীয় শিল্পীরা সর্বদাই মূর্তিকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এসেছেন।

জিনমূর্তির প্রধান লক্ষণ হল ঋজুভাব, দ্বিভুজ, দ্বিনেত্র, দ্বিপদ, আজানুলম্বিত বাহু, নিরাভরণ সর্বাঙ্গ, মনোহর রূপ, বক্ষস্থলে হেমবর্ণ শ্রীবৃক্ষ বা শ্রীবৎস চিহ্ন, শান্তপ্রসন্ন মূর্তি, বৃদ্ধবাল্যরহিত তরুণ দেহ, নখকেশহীন কক্ষাদিরোমহীনাঙ্গ শ্মশ্রুলেখাদিবিবির্জিত নির্বস্ত্রাঙ্গ শরীর। শান্তপ্রসন্ন-বৈরাগ্যভূষিতগুণ তপস্বী মূর্তি। মূর্তির দৈর্ঘ্য হবে ১০৮ নিজাঙ্গুল প্রমাণ। সঙ্গে থাকবে উপরে ত্রিবল্লী ছত্র। রথিকা থাকবে তিনটি, তোরণ অশোকদ্রুমপত্র-দেবদুন্দুভিবাদক শোভিত, সিংহাসন দুই গজসিংহ বিভূষিত, প্রভামণ্ডল, দিব্যধ্বনি, পুষ্পবৃষ্টি, কেবলবৃক্ষ প্রভৃতি। চৌরীধারী, যক্ষ থাকবেন নিম্নভাগে। কর্মচক্র পার্শ্বে যক্ষিণী। এছাড়াও স্বস্তিকা, দর্পণ, কুম্ভ, বর্ধমানক বেত্রাসন, দুটি ক্ষুদ্র মৎস্য, পুস্তক, পুষ্পমাল্য, নন্দাবর্ত প্রভৃতি অষ্টমঙ্গলা সহ নানা জৈনমূর্তি লক্ষণ থাকবে।

বর্ণবিন্যাস

পদ্মপ্রভ এবং বসুপূজ্য হবেন রক্তবর্ণ। চন্দ্রপ্রভ এবং পুষ্পদন্ত হবেন শ্বেতবর্ণ। নেমিনাথ এবং মুনিসুব্রত হবেন কৃষ্ণবর্ণ। মল্লি ও পার্শ্বনাথ হবেন নীল বর্ণ। বাকি সকলে হবেন কনকপ্রভ। অর্ঘ্যপট্ট হল জিনমূর্তি ও অষ্টমঙ্গলা প্রতীক সহ শিলাপট্ট। এছাড়াও কুষাণযুগে সর্বতোভদ্র মূর্তি সৃষ্ট হয়। সকলেই সম্মাননীয়, কিন্তু কয়েকজন জিন সুখপ্রদানকারী রূপে বিশেষ আদরণীয়, যথা শ্রীআদিনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ এবং মহাবীর। সর্বতোভদ্র মূর্তিতে সাধারণত ঋষভদেব বা আদিনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ ও মহাবীরের মূর্তি সন্নিবিষ্ট করা হয়।

মূর্তি নির্মাণের উপকরণ

মূর্তি নির্মাণের উপকরণ হিসেবে মণি, রত্ন, স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, মুক্তাফল, অমল স্ফটিক এবং শিলা প্রকৃষ্ট। বর্ধমান সূরি কাংস্য এবং সীসক ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছেন, কিন্তু গজদন্ত এবং কাষ্ঠ অনুমোদন করেছেন।

শিলার বর্ণ

কপোত, ভৃঙ্গ, কুমুদ বা পদ্ম, মাষ, মুদ্গ পাণ্ডু প্রভৃতি বর্ণের শিলা হল প্রশস্ত। কৃষ্ণবর্ণ বা শুক্লবর্ণ শিলা হবে হীরকসংযুতা।

মন্দির নির্মাণস্থল

শুভদিনে জিনমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হবে মন্দিরে। ভক্ত নিয়মিত মন্দির দর্শন করবেন। মন্দিরের অবস্থান হবে জন্মস্থান, নিষ্ক্রমণস্থান, কেবলজ্ঞানস্থান, নির্বাণস্থান, শুদ্ধ বা পুণ্য দেশ, নদীকূলে, পর্বতশৃঙ্গে, গ্রামাদির নিকটে, সমুদ্রপুলিনে।

বিগ্রহপূজার লোকায়ত তৃষ্ণার কারণেই তীর্থঙ্করদের মূর্তি রচিত হতে থাকে সারা ভারতে। মূর্তিকলার মধ্যে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক ধারা মতই নানা লক্ষণ সন্নিবিষ্ট হতে থাকল অত্যন্ত শিল্পশাস্ত্রের বিধান মেনে। বিপুল বিষয়ের একটি অতি সংক্ষিপ্তসার একত্র করা হল প্রাথমিক আলোচনার জন্য।

ক্রমিক সংখ্যা	তীর্থঙ্কর	লাঞ্ছন	যক্ষ	যক্ষিণী
১	ঋষভ	বৃষ	গোমুখ	চক্রেশ্বরী
২	অজিত	গজ	মহাযক্ষ	অজিতবলা
৩	সম্ভব	অশ্ব	ত্রিমুখ	দুরিতারী
৪	অভিনন্দন	কপি	যক্ষেশ্বর	কালিকা
৫	সুমতি	ক্রৌঞ্চ	তুম্বুরু	মহাকালী
৬	পদ্মপ্রভ	রক্তবীজ	কুসুম	শ্যামা
৭	সুপার্শ্ব	স্বস্তিক	মাতঙ্গ	শান্তা/শান্তি
৮	চন্দ্রপ্রভ	শশী	বিজয়	ভৃকুটি
৯	সুবিধি	মকর	জয়	সুতারিকা
১০	শীতল	শ্রীবৎস	ব্রহ্মা	অশোকা

১১	শ্রেয়াংশ	গণ্ডার	যক্ষেত	মানবী
১২	বাসুপূজ্য	মহিষ	কুমার	চণ্ডী
১৩	বিমল	শূকর	ষণ্মুখ	বিদিতা
১৪	অনন্ত	শ্যেন	পাতাল	অঙ্কুশী
১৫	ধর্ম	বজ্র	কিন্নর	কন্দর্পী
১৬	শান্তি	মৃগ	গরুড়	নির্বাণী
১৭	কুন্থু	ছাগ	গন্ধর্ব	বলা
১৮	অর	নন্দাবর্ত	যক্ষেত	ধারিণী
১৯	মল্লি	ঘট	কুবের	ধরণপ্রিয়া
২০	মুনিসুব্রত	কূর্ম	বরুণ	নাদরক্তা/নরদত্তা
২১	নমি	নীলোৎপল	ভৃকুটি	গন্ধর্বা
২২	নেমি	শঙ্খ	গোমেধ	অম্বিকা
২৩	পার্শ্ব	ফণী	পার্শ্ব	পদ্মাবতী
২৪	মহাবীর	সিংহ	মাতঙ্গ	সিদ্ধায়িকা।

কথিত হয় যে জৈনধর্মের উপদেশমূলক প্রাচীন জৈনাগম স্বয়ং মহাবীরের মুখনিঃসৃত বাণী। তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যরা ছিলেন গৌতম বা ইন্দ্রভূতি, সুধর্ম স্বামী প্রমুখ গণধরগণ। মহাবীর ও ইন্দ্রভূতির দেহত্যাগের পর গণধর সুধর্ম স্বামী জম্বুস্বামীকে উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর জম্বু প্রভবকে, প্রভাব শয্যম্ভবকে, শয্যম্ভব যশোভদ্রকে, যশোভদ্র সম্ভূতবিজয়কে এবং সম্ভূতবিজয় ভদ্রবাহুকে উপদেশ দান করেন। শিষ্য-পরম্পরায় অন্তর্ভুক্ত এই কয়জন শ্রুতকেবলী নামে খ্যাত হন।

জম্বুস্বামীর সময়ে দশ বস্তুর বিচ্ছেদ ব্যাখ্যাত হয়েছিল। পঞ্চম পট্টধর শয্যম্ভবস্বামী সাধুগণের নিমিত্ত দশবৈকালিক সূত্র প্রণয়ন করেছিলেন। ষষ্ঠ পট্টধর ও শেষ শ্রুতকেবলী প্রথম ভদ্রবাহু আবশ্যক নির্যুক্তি, দশবৈকালিক নির্যুক্তি, উত্তরাধ্যায়ননির্যুক্তি, আচারাঙ্গ নির্যুক্তি, বৃহদঙ্গনির্যুক্তি, ঋষিভাষিত নির্যুক্তি, কল্পনির্যুক্তি, এই দশখানি নির্যুক্তি এবং কল্পসূত্র, দশশ্রুতস্কন্ধ গ্রন্থ, ভদ্রবাহু সংহিতা নামক বৃহৎ জ্যোতিষ এবং উপসর্গহরস্তোত্র নামক স্তোত্র রচনা করে জৈনদের অশেষ উপকার করে গেছেন। সপ্তম পট্টধর দ্বিতীয় স্থূলভদ্রের সময় থেকে পট্টধর পরম্পরার নেতৃত্বে জৈন ধর্মের প্রসার ও বিকাশের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হলো।

নিজ শক্তিতেই জৈনধর্ম একসময় এক সারা ভারতেই প্রসারলাভ করে। একসময় সমকালীন সময়ে উদ্ভূত বৌদ্ধধর্ম অবক্ষয়িত হতে হতে প্রায় বিলুপ্ত হ'য়ে যায়, কিন্তু জৈনধর্ম প্রধানত বিত্তশালী বণিক সম্প্রদায়ের দ্বারা অনুসৃত হ'য়ে আজও তার গৌরব বজায় রেখে গেছে। বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্গত পুণ্ড্রবর্ধনে সম্রাট অশোকের সময়ে অনেকে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুস্বামী এক দ্বাদশবর্ষব্যাপী অনাবৃষ্টির আভাস পেয়ে আর্যাবর্তভূমি ত্যাগ করে দক্ষিণদেশে প্রস্থান করলেন। পথশ্রমে তাঁর মৃত্যু হ'ল। তাঁর প্রিয়শিষ্য বিশাখ চোলমণ্ডলে জৈনধর্মের বাণী প্রচার করেছিলেন। ভদ্রবাহুর অনুগামী গোদাস-গণ তাম্রলিপ্ত, কোটীবর্ষ এবং পুণ্ড্রবর্দ্ধন অঞ্চলে জনপ্রিয় ছিলেন। জৈনধর্ম বিশেষ প্রসারলাভ করেছিল বজ্রভূমির লাগোয়া পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি জেলার পাশাপাশি বর্ধমান জেলাতেও। পুরুলিয়া ও পশ্চিম বর্ধমানে জৈনধর্মে দীক্ষিত শ্রাবক জনগোষ্ঠী সরাক নামে পরিচিত। সরাক গোষ্ঠী তাদের বিনয় ও সদাচরণের জন্য বিশেষ খ্যাত।

সমগ্র রাঢ় অঞ্চল জুড়ে একদা জৈনধর্মের প্রসারের পাথুরে প্রমাণ অসংখ্য ভগ্ন ও অভগ্ন মূর্তি ও মন্দিরের অবশেষ ছড়িয়ে আছে। পূর্ব বর্ধমানের বাবলাডিহি গ্রামে কালো চিক্কণ পাথরে খোদাই তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের একটি খড়্গাসনে দণ্ডায়মান মূর্তি শিবজ্ঞানে পূজিত হয়। বর্ধমানেই আছেন শূলপাণি শিব, যিনি আদতে সম্ভবত শূলপাণি যক্ষ। জৈনধারার আত্মনিগ্রহের রেশ থেকে গেছে ধর্মঠাকুরের গাজনের সন্ন্যাসীদের নানা আচারে। ধর্মঠাকুরের কামিন্যা মনসা, যিনি সম্ভবত যক্ষিণী মানসী ও মহামানসীর রূপান্তর। নাগচ্ছত্র ও নাগধারিণী অনেক মূর্ত্তি পাওয়া যায় অনেক ধর্মঠাকুরের থানে। এই দেবী পদ্মাবতী কিনা তা অনুসন্ধানের বিষয়। বর্ধমান জেলার মধ্যে একটি বড় জৈন কেন্দ্র ছিল আঝাপুর সাতদেউলিয়া গ্রামে। সেখানে যেমন একটি প্রাক-তুর্কি-বিজয় পর্বের একটি অতিকায় রেখ-দেউল আছে, তেমনি পার্শ্ববর্তী নানা স্থান থেকে বহু জৈন মূর্তির সন্ধান

পাওয়া গেছে। সম্প্রতিক অতীতে ঐ অঞ্চলেই অবস্থিত বৈদ্যপুর গ্রাম থেকে তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের পঞ্চ-তীর্থিক মূর্তি বর্ধমানের সঙ্গে জৈন যোগাযোগকে আরো সুদৃঢ় করেছে।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা ও চিত্রবীথির সংগ্রহে বর্ধমানের নানা স্থান থেকে সংগৃহীত বেশ কিছু চিহ্নিত এবং অচিহ্নিত মূর্তির খণ্ড আছে। তাদের মধ্যে অন্তত চারটি নমুনা বর্ধমানের সঙ্গে জৈন যোগাযোগের পাথুরে প্রমাণ হিসেবে গণ্য হ'তে পারে।

১। আদিনাথ বা ঋষভনাথের মূর্তি। এই মূর্তিটি সংগ্রহ করা হয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুর গ্রাম থেকে। (মূর্তিটি কালচে পাথরে নির্মিত। আয়তন – উচ্চতা ১৬.৫ ইঞ্চি, প্রস্থ ৭.৩ ইঞ্চি)।

'প্রবচনসারোদ্ধার' গ্রন্থে জিনদের লাঞ্ছনের যে শ্রেণীবদ্ধ তালিকা পাওয়া যায় তার থেকে আমরা জ্ঞাত হই যে প্রথম তীর্থঙ্করের বিশেষ প্রতীক হল বৃষ। প্রথম জিনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৃক্ষ হল ন্যাগ্রোধ বা ভারতীয় বটবৃক্ষ। জিনের অপরাপর মূর্তিলক্ষণ হল তাঁর গোমুখ নামক যক্ষ (নামটি তার আকৃতির বর্ণনাত্মক) এবং যক্ষিণী চক্রেশ্বরী অথবা অপ্রতিচক্রা। ঋষভদেবের দুই পার্শ্বের উপাসকরা হলেন ভরত এবং বাহুবলী। বর্তমান মূর্তিটিতে আরো চারজন, সর্বমোট পাঁচজন তীর্থঙ্করকে একই ফলকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এটিকে সেই অর্থে সর্বতোভদ্র শ্রেণীতে ফেলা যাবে না।

জৈন গোষ্ঠীপতিদের ইতিহাসে ঋষভনাথ বা বৃষভনাথকে ধর্মের প্রবর্তক-রূপে দেখানো হয়েছে। দিগম্বরদের 'আদিপুরাণ', শ্বেতাম্বরদের 'কল্পসূত্র', হেমচন্দ্রের 'ত্রিষষ্ঠি-শলাকাপুরুষচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে এই ইতিহাসের বিস্তৃত বিবরণ সন্নিবিষ্ট হয়েছে। লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল যে ভাগবত, অগ্নি এবং বরাহের মত ব্রাহ্মণ্য-পুরাণে তিনি বিষ্ণুর অবতাররূপে উল্লেখ পেয়েছেন। অবশ্য তাঁর বৃষ-প্রতীক এবং মোক্ষস্থল কৈলাসকে বিবেচনার মধ্যে আনলে তাঁকে শিবের সঙ্গেও যুক্ত করার কথা মনে আসে। এক কথায় বলা যায় তিনি এক জৈন তীর্থঙ্কর এবং তাঁর প্রতিমার সঙ্গে ব্রাহ্মণ্যধারার কোনও মূর্তির সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ বা একেবারেই অনুপস্থিত। তাঁর প্রতীক বৃষ, কারণ তাঁর জননী প্রথম স্বপ্নে বৃষ দর্শন করেছিলেন। বৃষভনাথ বা ঋষভনাথ নাম এবং বৃষ লাঞ্ছন তাঁর মূর্তির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট।

২। দ্বিতীয় আলোচ্য মূর্তিটির কেবলমাত্র বেদী-অংশটি কালের ভ্রূকুটি সহ্য করতে পেরেছে। কালচে বেলেপাথরে খোদাই খণ্ডটির প্রস্থ ১১ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ১১.৫ ইঞ্চি। বেদীর উপরে যোগাসনে রক্ষিত দুই পদ ও আসনের নিম্নভাগের ঝালরের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। খণ্ডিত মূর্তিটির সবথেকে আকর্ষণীয় অংশ হ'ল নিম্নাংশের লাঞ্ছন একটি মকর বা কুম্ভীর এবং একটি জলকুণ্ড। জৈন মূর্তিলক্ষণ অনুসারে নবম তীর্থঙ্কর সুবিধিনাথের লাঞ্ছন বিষয়ে কিছু মতান্তর আছে। এক মত অনুসারে তাঁর লাঞ্ছন মকর; অপর এক মত অনুসারে তাঁর লাঞ্ছন কর্কট। সুবিধিনাথের পৃথক মূর্তি অত্যন্ত দুর্লভ।

সুবিধিনাথের দুটি নাম, অপর প্রদত্ত নাম হল পুষ্পদন্ত। তাঁর যক্ষ এবং যক্ষিণীর নাম অজিতা এবং সুতারী দেবী (দিগম্বর মতে মহাকালী)। চৌরীধারীর নাম মঘবটরাজ। কোন-কোনও মতে তাঁর কেবল-বৃক্ষ নাগ, অপরাপর মতে মল্লি।

তাঁর বংশের ইতিহাস থেকে জানা যায় তাঁর জন্মস্থানের নাম ছিল কাকন্দীনগর। তাঁর পিতা ছিলেন রাজা সুগ্রীব এবং মাতার নাম ছিল রামা; তাঁর নির্বাণস্থল সমেত-শিখর বা পার্শ্বনাথ পর্বত।

তাঁর দুই নামের উৎস পৃথক। তিনি 'সুবিধিনাথ' নাম অর্জন করেন যখন তাঁর কথায় রাজপরিবারের আত্মীয়রা এক অন্তর্কলহজাত যুদ্ধ ত্যাগ করে ধর্মকর্মে মনোযোগী হন। তাঁর পরিশেষে কলহপরায়ণ আত্মীয়দের মধ্যে 'সুবিধি' প্রতিষ্ঠা করে। অপর নাম পুষ্পদন্ত নামের কারণ হল তাঁর দন্তপংক্তি পুষ্পকোরকের সদৃশ ছিল। তাঁর লাঞ্ছন-সংক্রান্ত কাহিনীগুলি প্রাথমিকভাবে রহস্যময় বলে মনে হয়। জিনের মাতা কোনো মকর বা কর্কটের স্বপ্নদর্শন করেননি। তাঁর পিতা ছিলেন কাকন্দী-অধিপতি। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল কাকন্দী আবার কাকন্দীনগর যা সংস্কৃত কিষ্কিন্ধ্যানগর নামেও পরিচিত। স্মরণীয়, তাঁর পিতার নাম সুগ্রীব, মাতার নাম রামা। সবকিছুর মধ্যেই আশ্চর্যজনকভাবে রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যা ও সমুদ্র-লঙ্ঘনের কাহিনী অনুসঙ্গ জড়িত আছে। স্পষ্টতই মকর ও কর্কটের মত জলজ প্রাণী এই তীর্থঙ্করের লাঞ্ছন হয়ে উঠেছে। তাঁর যক্ষ অজিতের বাহনও কূর্ম এবং তাঁর যক্ষিণী সুতারা দেবী একটি কলস বহন করেন। কলসের সঙ্গে জলের সম্পর্ক নিবিড়। আলোচ্য মূর্তিটিতে কুমির এবং কুম্ভ দু'টিই স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

৩। তৃতীয় খণ্ডটি নিঃসন্দেহে চতুর্বিংশতিতম বা শেষ জিন সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থঙ্কর বলে খ্যাত মহাবীরের। লালচে পাথরে নির্মিত মূর্তির খণ্ডিত অংশটির উচ্চতা ২৭ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২৬ ইঞ্চি।

জৈনধর্ম, ইতিহাস এবং মূর্তিশিল্পে মহাবীরের শ্রেষ্ঠস্থান অবিসম্বাদিত। জিনদের মধ্যে তিনি সিংহসম এবং সিংহই তাঁর উপযুক্ত লাঞ্ছন। তাঁর যক্ষ মাতঙ্গ এবং যক্ষিণী সিদ্ধায়িকা। মগধরাজ শ্রেণিক বা বিম্বিসার তাঁর চৌরীধারী। তাঁর কেবল-বৃক্ষ শাল।

মহাবীরের জীবনেতিহাসের উপদান প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় কল্প-সূত্র, উত্তর-পুরাণ, ত্রিষষ্ঠি-শলাকা পুরুষচরিত, বর্ধমানচরিত প্রভৃতি গ্রন্থে। তাঁর জীবনের পঞ্চপর্বকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করে পঞ্চকল্যাণক। বর্ধমানের জীবনে অনেক আকর্ষণীয় ঘটনা ঘটেছিল।

বর্ধমান জন্মেছিলেন উত্তর বিহার বা বিদেহর এক রাজপরিবারে। তাঁর পিতা সিদ্ধার্থ ছিলেন নাত বা নায় গোষ্ঠীর বাস কুণ্ডপুরের নৃপতি। তাঁর মাতা ত্রিশলা নামে খ্যাত ছিলেন। তাঁর জন্মের সঙ্গে যুক্ত কিংবদন্তি হল যে তিনি প্রকৃতপক্ষে জালন্ধরের পরিবারে ঋষভ দত্তের পত্নী দেবনন্দার গর্ভে জন্ম নিয়েছিলেন। ঋষভ দত্ত ছিলেন ব্রাহ্মণ। যেহেতু প্রথা অনুসারে জিনেদের ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম হবে না, ইন্দ্র ভ্রূণটিকে তাঁর সেনাপতি হরিনেগমেষর সাহায্যে রাজবংশীয় ক্ষত্রিয় নারী ত্রিশলার গর্ভে স্থানান্তরিত করেন।

শিশুকাল থেকেই বর্ধমানের মধ্যে মহাপুরুষের লক্ষণ দেখা যেতে থাকে। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি গার্হস্থ্য জীবন যাপন করেন, কিন্তু ‘তাঁর পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি সন্ন্যাসজীবন গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর ভ্রাতার সম্মতি লাভ করেন। ভ্রাতা তখন সিংহাসনে আসীন। বর্ধমান তাঁর সব স্বর্ণ ও মণিরত্ন ত্যাগ করে দান করে দিলেন। সেগুলি তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হল। তারপর তিনি তাঁর শিবিকায় আরোহণ করে সুন্দবন (শ্বেত) বা সারথিখণ্ড (দিগম্বর মতে বৈশালীর কুণ্ডনগর) উদ্যানে গমন করলেন। সেখানে এক অশোকতরুর নীচে সকল রাজবেশ এবং রত্নাভরণ ত্যাগ করে কঠোর তপস্যার জীবনে প্রবেশ করলেন।

সেই শ্রদ্ধেয় তপস্বী এক বৎসর এক মাস বস্ত্র পরিধান করেন। তারপর নির্বস্ত্র হয়ে ভ্রমণ করতে লাগলেন। এই সময় তাঁর পাত্র বলতে কেবলমাত্র হস্তদ্বয় ব্যবহার করতেন। পূর্ণ দ্বাদশবর্ষ ছয় মাস সম্পূর্ণরূপে শরীরকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। শরীরের কোনওরূপ পরিচর্যা করতেন না। সম্পূর্ণ স্থৈর্য এবং অবিচলিত মনোভাব-সহ কাল কাটালেন। দুঃসহ অবস্থা তাঁর মনের উপর কোনও প্রভাব ফেলতে পারল না। পার্থিব জগতের প্রতি তাঁর কোনওরূপ আকর্ষণ ছিল না। এই আকর্ষণ চার প্রকারঃ ধনের স্বত্ত্ব, স্থান, কাল এবং স্নেহের বন্ধন। “ইহ জগৎ বা পরকাল, জীবন বা মৃত্যু

দুইয়ের প্রতি অনাসক্তি, পার্থিব বন্ধনের থেকে উচ্চতর মার্গে বিচরণ প্রভৃতির অস্ত্রে তিনি কর্ম-রূপ শত্রুকে বিনাশ করলেন।

মহাবীরের জীবনের তৃতীয় পর্ব তাঁর কেবল-জ্ঞানের দ্বারা বিভূষিত। দ্বাদশ বর্ষব্যাপী তপস্যা ও ধ্যানের পরে তাঁর যখন বেয়াল্লিশ বৎসর বয়স, তিনি পার্শ্বনাথ পর্বতের অদূরে ত্রিম্ভিকগ্রাম বা জৃম্ভিকগ্রাম নামক এক স্থানে গমন করলেন। সেখানে ঋতুবালিকা বা ঋজুবালিকা নদীর তীরে এক শালতরুর নিম্নে 'যে ভঙ্গিমায় মানুষ গাভী দোহন করে' (গোদুহাসন) সেই ভঙ্গিমায় গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন এবং কেবল-জ্ঞান লাভ করলেন। এই সময় থেকে তিনি হলেন অর্হৎ বা জিন।

অতঃপর তাঁর প্রচারকের জীবন শুরু হল। তিনি আমৃত্যু বা নির্বাণ পর্যন্ত মোট ত্রিশ বৎসর ধর্মপ্রচার করেন। তাঁর দর্শনে মূল কথা হল যে জন্ম, বর্ণ, শাস্ত্রের বিধানের কোনই মূল্য নেই। কর্মই সবকিছুর নিয়ন্তা। কঠোর তপস্যার মধ্য দিয়ে কর্মফল বিনাশ করে জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। দিগম্বরদের দাবি অনুসারে তিনি ত্রিশ বৎসরে মগধ, বিহার, প্রয়াগ, কৌশাম্বী, চম্পাপুরী এবং উত্তর ভারতের আরও অনেক শক্তিশালী রাজ্যকে জৈনধর্মে দীক্ষিত করেন।

এখন আমরা সংক্ষেপে তাঁর নামের উৎস এবং প্রতীকের তাৎপর্য আলোচনা করব। যে দুই প্রধান নামে তিনি পরিচিত তাদের ব্যাখ্যা আছে। "যখন থেকে রাজপুত্রকে ক্ষত্রিয়াণী ত্রিশলার গর্ভে স্থাপনা করা হয়, তখন থেকেই পরিবারের স্বর্ণ, রৌপ্য, ধন, শস্য, রত্ন, মুক্তা, শুক্তি, মূল্যবান প্রস্তর এবং প্রবাল বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং রাজপুত্রের নাম হল বর্ধমান। তাঁর নাম হল বীর বা মহাবীর কারণ তিনি কর্মকে জয় করেন। তাঁর লাঞ্ছন সিংহ যথার্থই আধ্যাত্মিক বীরভাবের প্রকাশক। তাঁর স্থৈর্য, তপস্যা, কর্মের বিনাশের পথে তাঁর কঠোর প্রচেষ্টা অবশ্যই সিংহ-সদৃশ ব্যক্তিত্বের নির্ভুল অভিজ্ঞান। বস্তুত সমস্ত জিন তীর্থঙ্করদের মূর্তির মাঝে তাঁর মূর্তি যেন সিংহ-সদৃশ।

৪। সিংহসম এক রাজকীয় ব্যক্তিত্বের গৌরব বিজড়িত হয়ে আছে বর্ধমানের পার্থিব এবং আধ্যাত্মিক জগতে। এই সূত্রেই একই সংগ্রহশালায় রক্ষিত কালো পাথরে নির্মিত প্রাচীন সিংহবাহিনী অষ্টভুজা মূর্তিটিকে (উচ্চতা ৩৩ ইঞ্চি, প্রস্থ ১৯ ইঞ্চি আনুঃ) তাঁর যক্ষিণী সিদ্ধায়িকা বলে চিহ্নিত করতে পারি কারণ তাঁর লাঞ্ছন এবং বাহন সিংহ এবং একহস্তে যক্ষিণীর চিহ্ন মাতুলুঙ্গ বর্তমান। শ্বেতাম্বর মতে মহাবীরের যক্ষিণী সিদ্ধায়িকা সিংহবাহনা এবং তাঁর চারিহস্তে ধৃত

পুস্তক, অভয়-মুদ্রা, মাতুলিঙ্গ এবং বীণা। দিগম্বর মতেও দেবী সিংহবাহনা এবং হস্তে ধৃত বরদ-মুদ্রা এবং পুস্তক। অঞ্চল-বিশেষে রক্ষাকর্ত্রী যক্ষিণী সিদ্ধায়িকা নানারূপে নানা অস্ত্রে সজ্জিতা রূপে কল্পিতা হতেই পারেন। একই সঙ্গে একটি অচিহ্নিত জিনমূর্তি ও ছত্র প্রদর্শনের জন্য সংরক্ষিত আছে।

জৈনধারার এই মূর্তিগুলির প্রাপ্তিস্থল সম্পর্কে তথ্য সুনির্দিষ্ট নয়, তবে তারা বর্ধমান জেলারই বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত এটুকু নিশ্চিত করে বলা যায়। এককালে চর্চিত সমৃদ্ধ জৈন ঐতিহ্যের স্বাক্ষর বহন করছে সংগ্রহশালা ও চিত্রবীথির এই সংগ্রহগুলি।

গ্রন্থঋণ ও কৃতজ্ঞতাঃ

আচারঙ্গ-সূত্র, অনুবাদ করেছেন হীরাকুমারী ব্যাকরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ। প্রকাশক শ্রীজৈন শ্বেতাম্বর তেরাপন্থী মহাসভা, কলকাতা

বিশ্বকোষ, ৭ম খণ্ড, জৈনধর্ম, নগেন্দ্রনাথ বসু, কলকাতা,
সাতটি জৈন তীর্থ, গণেশ লালওয়ানি, কলকাতা বীরাব্দ ২৪৯০
বর্ধমান জেলায় জৈনধর্ম, ড. সর্বজিৎ যশ। বর্ধমান জৈন সমাজ। ২০২০
প্রত্নকল্পতরু দ্বারকেশ্বর, বিপ্লব বরাট, বাঁকুড়া, ২০২৪।
The Jaina Iconography by B.C. Bhattacharya, Foreward by B. N. Sharma. Motilal Banarasidas.
The Heart of Jainism, Mrs Sinclair Stevenson, 1915
An Epitome Of Jainism by Puran Chand Nahar and Krishnachandra Ghosh , Calcutta, 1917
Greater Magadha, Studies in the cultures of Early India, by Johannes Bronkhorst, Delhi, 2013
Harappa and Jainism, by T.N. Ramachandran, New Delhi, 2017
কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ শ্রী শ্যামসুন্দর বেরা, তত্ত্বাবধায়ক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহশালা ও চিত্রবীথী। জৈন মূর্তির নমুনাগুলি এই সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত।

The Place of Women in Jainism

By: Sanchita Ghosh

Emerging around the 6th century BCE, the present form of Jainism arose alongside Buddhism. However, unlike Buddhism, which spread internationally, Jainism's presence remains primarily concentrated in parts of India. Followers of Mahavira, the 24th Tirthankara, form a minority in India, and their financial and social status places them far from the margins. With impressive literacy rates, educational achievements, and other accomplishments, Jains are among the leading communities in almost all socio-economic aspects of India. Due to their strict adherence to non-violence, agriculture, being the country's primary occupation, was not an option for them; thus, commerce became their primary means of livelihood.

Women have a significant role in Jainism, both in religious education and practice, though their role has evolved over time. Jainism is primarily known for its principles of Ahimsa (non-violence), Satya (truth), Aparigraha (non-attachment), and Asteya (non-stealing). These principles provide spiritual equality in various ways, though cultural customs at different historical periods also reflect the changing role of women.

Jainism believes that all souls are equal and have the potential to attain Moksha (liberation). Women are not inherently excluded from the spiritual path, though some Jain sects hold differing views on whether women can attain liberation in their current form. Digambar Sect Traditionally holds that women must first be reborn as men to attain liberation, as they believe that the practice of complete renunciation that

includes Digambaratva (nakedness) is incompatible with female physiology. On the other hand, Shwetambar Sect Believes women can directly attain Moksha, and several women are noted to have done so. The first soul tahat attained mOkSha in this Avasarpini was not a man, but a women. She is no other than MarudevI, the mother of the first Tirthankara Rishabhanatha.

The 19th Tirthankara of the current era, Mallinath, was a woman according to Swetambara Jain tradition, providing evidence that women can attain the highest spiritual honor. King Kumbh and Queen Prabhavati of Mithila had a daughter, Mallikuvri (Mallinath), renowned for her extraordinary beauty and intelligence. Her beauty became so widely praised that six powerful kings, who had each heard of her through different incidents, separately sent marriage proposals.These six kings, unknown to them, were actually Mallinath's close friends from a previous birth. King Kumbh feared conflict and declined all proposals, prompting the kings to attack Mithila.Using her transcendental knowledge (Avadhignan), Mallinath recognized who they truly were. She devised a clever plan: she had a golden statue of herself made, hollow inside, into which she dropped a morsel of food daily. She placed it in a chamber divided into six partitions so that each king would see the statue but not each other. When the kings gathered, each believed the statue was the real Mallikuvri and rushed toward it. Seeing each other, they began fighting. Mallinath then opened the statue's lid, releasing a foul stench from the decayed food inside. This shocked the kings, who recoiled. Mallinath used this moment to deliver a profound teaching: the human body is temporary and impure, and attachment to physical beauty leads only to delusion and suffering. She reminded them of their shared past life of friendship and spiritual aspiration. The kings regained their past-life

memory (Jatismaran Gnan), repented, and abandoned their worldly attachments. Mallinath herself remained celibate, renounced the world, and attained Keval Gnan (omniscience) the same day. During her first divine discourse (deshna), the six kings also renounced and achieved Self-Realization. After long years of teaching, Lord Mallinath attained Nirvana at Sammet Shikhar.

Jain monks are divided into male monks (Sadhus) and female monks (Sadhwis). The number of the Sadhwis are always significantly bigger than the Sadhus at the Samavasharana of each and every Tirthankara, Sadhus and Sadhwis in Jainism take vows of celibacy, strict discipline, renunciation, and focus on spiritual development. They play an important role in preserving and imparting religious teachings.

Jain women who do not take monastic vows still play an important role in the religious community. They participate in temple rituals and maintain family religious practices.

While Jainism promotes spiritual equality, some scriptures state that menstrual blood is a sign of impurity. However, the idea that menstruation spiritually impure for women is inconsistent with Jain logic, as Jainism is generally concerned with right thought, speech, and actions, without considering natural bodily functions as spiritual barriers. Despite this, social norms and interpretations may have led to some gender discrimination.

In modern times, Jain women are increasingly taking leadership roles in religious, educational, and social reform movements. Many have become teachers of Jain philosophy and advocates for animal welfare, environmental

protection, and the promotion of non-violence, reflecting the core teachings of Jainism.

Women, especially the mothers of Tirthankaras, are highly revered in Jainism. Their maternal qualities are celebrated, and they are often honored as goddesses. Ambika is a family deity in the Porwada (Pragvat) Jain community, and while all Shwetambar image-worshipping Jains revere her, Porwada Jains give her special honor. Female spiritual guides are prominent in Jain worship, and women are also revered in Jain tradition as goddesses such as Padmavati, Ambika, and Chakreshwari, who symbolize wealth, health, and prosperity. Worship of these female deities is common, as they are believed to be more accessible than the great Tirthankaras.

The Shola (sixteen) Sati legends and hymns are considered exemplary models of women's devotion, as they remained faithful to their husbands even in the most difficult situations. Additionally, the goddess of knowledge, Saraswati, the Matrikas representing eight core principles of Jain philosophy, and the various goddesses representing different branches of knowledge, are also honored as symbols of learning in Jainism.

Many Jain women have been significant sources of inspiration for men. The works of great Jain scholars are often attributed to the influence of their mothers or sisters. Numerous ideal women have encouraged their husbands to use their wealth for noble and religious purposes, leading to the construction of temples and the organization of pilgrimages. Jain nuns have played a vital role in the abolition of practices like Sati (widow burning), slavery, and animal sacrifice, strongly opposing them. A Jain woman has

complete freedom and discretion to choose between marriage or dedicating her life to celibacy and religious devotion.

Women can also participate freely in religious assemblies and listen to discourses. Many Jain women have achieved liberation and high social standing. Mahatma Gandhi was greatly inspired by certain ideal Jain female ascetics, and it is said that he even met them.

Thus we can find that in Jainism, the spiritual identity of every being is rooted not in gender, caste, or social position, but in the eternal soul (jiva), which is inherently pure and capable of attaining liberation. This foundational belief places women and men on essentially equal spiritual ground. While historical customs and sectarian interpretations have sometimes differed, the core philosophical framework of Jainism strongly advocates spiritual equality, intellectual independence, and moral agency for women. Across centuries, Jain women have been scholars, ascetics, philosophers, teachers, and reformers. They have shaped religious discourse, guided communities, and inspired social transformation through their commitment to ahimsa, compassion, learning, and self-discipline. The Shwetambar tradition's recognition of Mallinath, the 19th Tirthankara, as a woman stands as a profound testament to Jainism's affirmation that the highest state of enlightenment is attainable regardless of gender. In contemporary Jain communities, women continue to take leadership roles—preserving scriptures, leading charitable movements, promoting education, championing non-violence, and influencing moral and cultural life. Their increasing visibility in public religious dialogue reflects the living spirit of Jain philosophy, which celebrates the pursuit of truth and liberation in all. Thus, while interpretations have evolved over time, the essential message of

Jainism—equality of all souls and the universal potential for liberation—continues to empower women and men alike. Jainism today stands as a spiritual tradition that not only recognizes but also honors the transformative contributions of women on the path to self-realization and societal harmony.

প্রাচীন ঐতিহ্য-সৌন্দর্যের গর্বে আজও গর্বিত সরাক সম্প্রদায়

- অরুণ কুমার মাজি (অরুণ) পুঁচড়া, পশ্চিম বর্ধমান

"যে জাতির পূর্ব্বমাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্যরক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিন্‌কুরের স্মৃতির ফল ব্লেন্‌হিম্‌ ও ওয়াটর্লু—ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে" - ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র।

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত ইতিহাস লেখা হয়েছে, সবকিছুই অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে; পেরিয়ে যাওয়া দিন কাল পাত্র ও সময়ের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে। ইতিহাস মানেই তো তা'ই। তাই অতীত আমাদের কাছে অত্যন্ত স্মরণীয় সম্পদ। পার হয়ে যাওয়া দিনগুলির অধুনা বৈকুণ্ঠবাসী মানুষজন আমাদের সকলের কাছে ততোধিক শ্রদ্ধেয় ও পূজনীয় জন হিসাবে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে বিরাজ করবেন। তাঁদের মার্গদর্শন বা পথনির্দেশ আমদের কাছে একমাত্র পাথেয় বলে আমার মত সকলের মনে করা উচিত, এবং সেই রকম বিশ্বাস রেখে আজকের দিনে চলতে শেখা উচিত।

অতীত যারা ভুলে যায়,
ভবিষ্যৎ তাদের ক্ষমা করে না।
ইতিহাসের মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকেও
তারা খুঁজে পায় না নিজের শিকড়।

শিকড় ভুলে গেলে
পাতা-ফুলেরও আর কোনো মানে থাকে না—
নিঃস্ব রিক্ত করে
বাতাসে উড়ে যায় সব।

তাই কলম ধরেছি আজ,
হারানো গৌরবের খোঁজে;
যদিও বার্ধক্যের নিঃশ্বাস
চায় থামিয়ে দিতে শব্দের স্রোত,
তবু লিখি—

কারণ এই লেখা
বিস্মৃতির বিরুদ্ধে আমার প্রতিরোধ।

অতঃপর প্রবন্ধের প্রারম্ভিক পর্বে বলে রাখা ভাল যে, মাননীয় শিক্ষক সুখময় মাজী ও আসানসোলের আইনজীবী মাননীয় অভিজিৎ মণ্ডল মহাশয়দ্বয় – "সরাকরা কি জৈন?" প্রশ্নটি আবিষ্কার করে আমার মত এক অযোগ্য ব্যক্তিকে জানিয়ে উত্তর চেয়েছেন। আমি মনে করি, আজকের দিনে এই প্রশ্ন অত্যন্ত সময়োপযোগী। এই দুজন ছাড়াও এই প্রশ্ন অন্য অনেকের মনে বাস বেঁধে আছে। এঁরা দুজন উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছেন, অন্য অনেকে করেন না; এটুকুই তফাৎ। আমি কিছু কিছু বাংলা ও হিন্দি ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা থেকে জেনেছি যে, এই প্রশ্ন আজকের নতুন প্রশ্ন নয়- এই প্রশ্নের ধারাবাহিকতা প্রায় একশত বছরের আগে থেকেই চলে আসছে; বা তারও আগে থেকে বললেও অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু এর উত্তর দিতে কেউ আগ্রহী হয়েছিলেন কিনা, জানি না। হ্যাঁ, একটা কথা প্রথমেই মাননীয় পাঠকবর্গের গোচরে এনে রাখতে চাই যে, আমি এই প্রশ্নের যে উত্তর আমি দিতে চলেছি, তা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে অকাট্য সত্য। এখানে এ কথা বলা বাহুল্য হবে না যে, আমি অরুণ কুমার মাজি, পিতা – স্বর্গীয় জয়রাম মাজি এবং মাতা - স্বর্গীয়া সরলা বালা মাজি, সর্বসাকিম পুঁচড়া - হাতে প্রমাণ না থাকলে কাগজ কলমের অপব্যয় করি না। তবু প্রমাদবশতঃ আমার লেখায় কোনো ত্রুটিবিচ্যুতি কোনো অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী সজ্জনের দৃষ্টিতে যদি ধরা পড়ে, সেক্ষেত্রে তাঁর মতামত ও বক্তব্যকে অবশ্যই স্বাগত জানাব। তার প্রেক্ষিতে তিনি যেন আমায় লিখিতভাবে বা সাক্ষাতে পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেন। পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে আমরা তাহলে ইতিহাসকে আরও সুন্দরভাবে গ্রন্থন করতে পারব, যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এক অমূল্য সম্পদরূপে বিবেচিত হতে পারবে।

আমি সরাক বা সরাক নন, এমন অনেক গুরুজনের কাছ থেকে জেনেছি যে, আমাদের দেশে অনেক সমাজের অনেক মানুষ তাঁদের পূর্বপুরুষদের নামকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ছেলে মেয়েদের নাম রাখতেন। ইতিহাসে আমরা পালবংশে বিভিন্ন সময়ে তিনজন গোপাল এবং তিনজন বিগ্রহপালের উল্লেখ পাই। গুপ্তবংশে তিনজন রাজার নাম ছিল কুমারগুপ্ত। এ বিষয়ে আমারও নিজস্ব কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। আমাদের সরাক সমাজের পূর্বজগণ ছিলেন অত্যধিক বুদ্ধিমান। (এর প্রমাণ আজও মেলে; সরাকবহুল গ্রামে বিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের তালিকায়

অধিকাংশ ক্ষেত্রে সরাক ছেলেমেয়েদের নাম থাকবেই। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুর এলাকার বিজ্ঞানের শিক্ষকদের অধিকাংশই সরাক জাতির বলে ঐ এলাকার লোকেদের মুখে শোনা যায়)। তাই তাঁরা তাঁদের পূর্বজ মহাপুরুষ জৈন শ্রমণ ধর্মের আদিপুরুষ প্রথম তীর্থঙ্কর ভগবান আদিদেব বা ঋষভদেব বা আদিনাথ বা ঋষভনাথ স্বামীকে তাঁদের গোত্রনামে ধারণ করেছিলেন। সেই আদিনাথ ঋষভদেব অদ্যাবধি সরাকহৃদয়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বিরাজ করছেন। হাজার হাজার বছর পার হয়ে গেলেও শত সহস্র ঝড়ঝাপটা সহ্য করে বেঁচে থাকতে হলেও, অনেক কিছু পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হলেও সরাক জাতির কাছ থেকে তাঁদের গোত্র পিতা তাঁদের পূর্বজ মহাপুরুষের নামটি কেউ ছিনিয়ে নিতে পারেন নি। এ প্রসঙ্গে আমি প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে, অতীত আমাদের কাছে মহা মূল্যবান স্মরণীয় সম্পদ, যে সম্পদ রক্ষা করতে পেরে আমরা সরাক সম্প্রদায়ের লোকেরা আজও গর্বিত। এ গর্বের শেষ নেই, অন্ততঃ সরাকজাতির সামান্যতম অস্তিত্বও যতদিন সুরক্ষিত থাকবে। এই সুবাদে আমি শ্রদ্ধেয় পাঠক বন্ধুগণের অবগতির জন্য সরাক জাতির গোত্র সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করতে আগ্রহী।

অনেকেই জানেন যে, আবহমান কাল থেকে চিরচরিত প্রথা অনুযায়ী জৈন সাধু ব্রহ্মচারী যতি মহারাজগণ বর্ষাকালের চার মাস বিহার বন্ধ করে আপন আপন নির্বাচিত কোনো জৈন মন্দির ধর্মশালা বা উপাশ্রয়ে অবস্থান করেন। একে চাতুর্মাস বলে। এই রকম ভাবেই বিগত ১৯৮২ খৃষ্টাব্দের বর্ষাকালে শ্রী দিগম্বর জৈন সাধুসমাজভুক্ত তৎকালীন সবচেয়ে বিখ্যাত আচার্য্য সন্তশিরোমণি শ্রী বিদ্যাসাগরজী মহারাজ তাঁর সংঘ সহ ঝাড়খন্ড প্রদেশের গিরিডি তোলার অন্তর্গত পারসনাথ রেল স্টেশন সংলগ্ন ইসরী নগরের উদাসীন আশ্রম শান্তিনিকেতনে অবস্থান করেছিলেন। জৈন সমাজে সাধু-সাধ্বী-শ্রাবক-শ্রাবিকা নিয়ে চতুর্বিধ সংঘ সর্বজনবিদিত। তাই উক্ত শান্তি নিকেতনে কোনকিছুরই ত্রুটি ছিল না। যাঁরা মহারাজের সেবার্থে এই চারমাস সেখানে থাকতে পেরে পুণ্যার্জন করে ধন্য হয়েছিলেন তাঁরা বাস্তবিক পক্ষে জীবন সার্থক বলে মনে করেছিলেন। আমি তাঁর কয়েক বছর আগেই ১৯৭২ সালে নতুন দিল্লী নিবাসী ভারতের তদানীন্তন সপ্তম বৃহত্তম শিল্পপতি সাহু শান্তিপ্রসাদ'জী জৈন মহাশয় দ্বারা পরিচালিত শ্রী সরাক জৈন সমিতির (খরখরী, ধানবাদ) অধীনে প্রথম প্রচারক পদে নিযুক্ত হয়েছিলাম। সমিতির সভাপতি ও শান্তিনিকেতনের (ইসরী) সম্পাদক শ্রদ্ধেয় শিখরচাঁদজী জৈন মহাশয়ের আনুকুল্যে শ্রী বিদ্যাসাগরজী মহারাজের দর্শনধন্য ও আশীর্বাদধন্য হয়ে উক্ত চার মাস অন্য অনেক শ্রাবকশ্রাবিকাদের মতোই মহারাজশ্রীর

সামান্য সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করতে পেরেছিলাম। শুধু তাই নয়, যেদিন থেকে মহারাজশ্রীর কৃপায় তাঁর সাথে পরিচয় হয়েছিল, সেইদিন থেকে মহারাজশ্রীর মঙ্গলময় আশীর্বাদে বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া, রাঁচী, সিংভূম জেলা থেকে পালা করে পনের-পনের দিন মেয়াদে কিছু কিছু ছাত্র এনে জৈন ধর্ম শিক্ষার শিবির করে মহারাজশ্রীর অতি নিকটের সেবকরূপে পরিগণিত হতে সমর্থ হয়েছিলাম। সরাক জাতি সম্পর্কে যখন মহারাজশ্রী পুরোপুরি জানলেন, তখন প্রবচন কালে বেশীর ভাগ যথেষ্ট সময় ও গুরুত্ব দিয়ে সরাক জাতির কথা চর্চা করতেনতেন। তাঁর বক্তব্যগুলির সারমর্ম এটাই ছিল যে, সরাকদের আদিপুরুষ তথা গোত্রপিতা আদিকাল থেকেই হওয়ার দরুন সারা ভারতবর্ষে সরাক জাতি 'শ্রাবক' থেকে 'সরাকে' অপভ্রষ্ট হলেও এরাই যে আদিদেব পরম্পরার প্রাচীন জৈন তাতে সংশয়ের বিন্দুমাত্র কারণ নেই। যে কুড়িজন তীর্থঙ্করের মোক্ষভূমি নির্বাণভূমি হাজারিবাগের পাহাড় থেকে মানভূম, বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমান জেলার বুক দিয়ে বিস্তৃত, সেই নির্বাণভূমির প্রাচীন কাল থেকেই একমাত্র আরাধক, উপাসক এবং সংরক্ষক সরাক সম্প্রদায়ের লোকেরাই। যেহেতু সরাকদের প্রথম পুরুষ ও গোত্রপিতা হিসাবে আদিদেব ঋষভনাথের নাম সর্বজনবিদিত, তাই তাঁরা আদিতম জৈন এবং সেই সুবাদে এই সরাক জাতি এই বিশাল পুণ্যভূমির সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাস করে আজ পর্যন্ত সম্মেদশিখরকে যে আপন সন্তানের ন্যায় রক্ষা করে আসছেন তা বলাই বাহুল্য । এই প্রবন্ধ লিখতে বসে আমি অনির্বচনীয় পুলক অনুভব করছি; কারণ স্বয়ং অচার্যশ্রীর শ্রীমুখ একথা থেকে শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল যে সরাক সম্প্রদায়ের প্রতিটি মানুষ প্রাচীন জৈন পরম্পরার সন্তান।

মহাজ্ঞানী আচার্যশ্রীর বক্তব্য সমগ্র জৈন সমাজের প্রতিটি মানুষের কাছে বেদবাক্য স্বরূপ। কিন্তু অজৈন মানুষদের কোনো দায় থাকে না শুধু আচার্যশ্রীর কথাকেই ঐতিহাসিক তথ্য হিসেবে গ্রহণ করার। তাই আমাকে এখানে সরাক সম্প্রদায়ের লোকেরা যে জৈন শ্রাবক পরম্পরার উপাসক তার অকাট্য সত্য প্রমাণ দিতে হবে। এই অকাট্য উদাহরণ আমার মহাতীর্থ পবিত্র জন্মভূমি পুঁচড়া, যাঁর প্রাচীন নাম ছিল 'পঞ্চচূড়া'। জৈন শ্রমণশাস্ত্রের মতে যিনি চব্বিশতম তীর্থঙ্কর, সেই বর্ধমান মহাধীর স্বামীর পদরেণু-প্লাবিত লোকশ্রুতি আজও এ অঞ্চলে জীবিত। ভগবান মহাবীর স্বামীর এই অঞ্চলে বিহারের স্মৃতি হল 'পঞ্চচূড়া' ওরফে পুঁচড়া। পুঁচড়ার বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মহানির্দেশক পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্ত মহাশয় বিভিন্ন জায়গায় আলোচনা করেছেন। ১৩৮৪ সালে প্রকাশিত 'সরাক সমাজ স্মরণিকা'য় তিনি এই মত ব্যক্ত করেছেন যে সরাক

সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাচীন জৈন শ্রমণ ধর্মের ধারক ও বাহক। ১৩৪৮ সালে 'সরাক বন্ধু' পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যায় শ্রী কাশীনাথ জৈন মহাশয়ও অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এই অভিমতগুলি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাথে মেলানোর পর আমারও অনুসিদ্ধান্ত এই যে, ঐতিহাসিকভাবে সরাক জাতি হল প্রাচীন শ্রাবক অর্থাৎ গৃহী জৈন সম্প্রদায়ের উত্তরসূরি এবং তাঁরা তাঁদের শিরায় শিরায় বহন করে চলেছেন আদি তীর্থঙ্কর আদিনাথের উত্তরাধিকার।

এখন অনেকের মুখে মুখে ঘোরে যে, ভগবান মহাবীর স্বামীর পদরেণুতে আজ থেকে আড়াই হাজার বছরের কিছু বেশী সময় পূর্বে এই রাঢ় (লাঢ়) অঞ্চল ধন্য হয়েছিল। তখন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছোটো ছোটো গ্রামগঞ্জের কোনো নামকরণ হয় নি। কথিত আছে, জঙ্গলাকীর্ণ এই অঞ্চলে আদিদেব গোত্রধারী মানুষজন বাস করতেন। ভগবান মহাবীর স্বামীর পদার্পণ-স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এই প্রাচীন জনপদের প্রাচীন শ্রাবক পরম্পরার মানুষজন এদের বাসভূমির চারদিকে চারটি এবং মধ্যখানে একটি মোট পাঁচটি চূড়া বিশিষ্ট মন্দির নির্মাণপূর্বক যে গ্রামটির স্থাপনা করেন, সেই পাঁচটি চূড়া বিশিষ্ট জনপদটির নামকরণ করা হয় 'পঞ্চচূড়া', যা কালক্রমে বিবর্তিত হতে হতে আজকের 'পুঁচড়া'য় পরিণত হয়েছে। এই পাঁচটির মধ্যে একটি চূড়ার অবলুপ্তপ্রায় স্মৃতিচিহ্ন প্রাচীন ইতিহাসের নীরব সাক্ষী হয়ে আজও টিঁকে রয়েছে পুঁচড়ার দক্ষিন দিশায় রাজপাড়ার পবিত্র মাটিতে। সরাক সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাচীন কাল থেকেই যে জৈন, পুঁচড়া গ্রামের উক্ত পবিত্র স্মৃতি তার একটি অকাট্য প্রমাণ। যাতে সরাক সম্প্রদায়ের, বিশেষ করে উক্ত প্রশ্নকর্তাদের সন্দিগ্ধ চিত্তের সমস্ত অস্পষ্টতা দূর হয়, তার জন্য এই পাথুরে প্রমাণের কথা উল্লেখ করলাম।

এছাড়া বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার অন্তর্গত বহুলাড়া গ্রামে তেইশতম তীর্থংকর পার্শ্বনাথ স্বামীর বিশাল প্রাচীন মন্দিরটি রয়েছে সেটিকেও একটি অকাট্য প্রমাণ বলে মনে করি। বহুলাড়ায় অবস্থিত প্রাচীন জৈন মন্দিরটি আমি একাধিকবার পরিদর্শন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম। মন্দিরের ভিতরে তিনটি অখণ্ডিত প্রতিমা বিরাজমান; মাঝখানে ভগবান পার্শ্বনাথ, বাঁদিকে সিদ্ধিদাতা গণেশজী আর ডান দিকে রয়েছেন ধনসম্পদের দেবী শ্রীশ্রী লক্ষ্মী মাতা। প্রতিমাগুলি সবই কালো পাষাণে নির্মিত। সেই সময় (১৯৭৫-৭৬) মন্দিরটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে রয়েছে বলে তৎকালীন সেবাইত মাননীয় মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জানিয়েছিলেন। তিনি আরো জানিয়ে ছিলেন যে, এই অঞ্চলে বহুলাংশে সরাক তন্তুবায়দের বসবাস

ছিল। ঐ সরাকগণ জৈন ভগবান পরেশনাথ, সিদ্ধিদাতা গণেশ এবং ধনের দেবী লক্ষ্মীমাতার পরম ভক্ত ছিলেন বলে শুনেছি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, কোন কোন লেখক বাঁকুড়া বর্ধমান বিষ্ণুপুর মেদিনীপুর তথা উড়িষ্যায় বসবাসকারী শ্রাবক সরাক সম্প্রদায়ের লোকেদের 'নদীপারিয়া' আাখ্যায় ভূষিত করেছেন; ফলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি জোর দিয়ে বলতে পারি যে, সেই সমস্ত লেখকদের এসব উক্তি ভিত্তিহীন। আমরা যারা বর্দ্ধমান বাঁকুড়া-মেদিনীপুর বিষ্ণুপুর এবং উড়িষ্যায় বসবাসকারী সরাক রয়েছি তাঁরা সকলেই কিন্তু সরাসরি ভগবান মহাবীর স্বামীর আশীর্বাদধন্য প্রাচীন কালের বাসিন্দা। আমরা কারো দ্বারা বিতাড়িতও নই, আর কারো ভয়ে ভয়ভীত হয়ে পালিয়েও আসি নি। কোনো টেবিল-টপ গবেষণা নয়, প্রকৃতই অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিরা একটু গভীরে গিয়ে অনুসন্ধান করলেই আমার এই দাবির সত্যতা সম্পর্কে জানতে পারবেন। শুধু তাই না, আমিও এই বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর সাথী হতে পারার সুযোগ পেয়ে ধন্য হতে পারব।

সরাক অধ্যুষিত অঞ্চলে হাজার হাজার বছর আগে থেকে জিনালয়গুলি নির্মিত হয়েছে বলে অনেক গুণী জ্ঞানী ব্যক্তির তথা ঐতিহাসিকদের লেখা থেকে জানা যায়। এই প্রসঙ্গে আমার প্রশ্ন যে, সরাক সম্প্রদায়েরর লোকেরা যদি প্রাচীন জৈন শ্রমণ ধর্মের উপাসক না হতেন, তাহলে কোন সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ সব জিনালয়গুলির ও জিনালয়ে বিরাজিত প্রতিমাগুলির সংরক্ষক ও উপাসক ছিলেন? প্রশ্নকর্তারা এর সঠিক উত্তর দিতে পারবেন কি? আমি যে সময়ের কথা ব্যক্ত করতে চাইছি সেই সময় তো উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বর্তমানে যাঁরা জৈন বলে পরিচিত, তাঁরা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে প্রভাবিত ছিলেন।

আরও একটি অকাট্য উদাহরণ পাঠকবর্গের সমীপে পেশ করছি। আমি উনষাট বছর আগে রাজস্থানের 'বালি' গ্রামে উপধ্যান তপ করার জন্য গিয়েছিলাম। 'বালি' গ্রামে বালির উপর বালি খুঁড়ে একটি মনোরম মন্দির নির্মিত হয়েছে। সেখানে বালি খুঁড়তে খুঁড়তে প্রায় ১৫-২০ ফুট নীচে শ্বেত পাথরে নির্মিত ১৬তম তীর্থঙ্কর ভগবান শ্রীশ্রী শান্তিনাথের মূর্তি পাওয়া যায়। সেই মূর্তির উপর লেখা আছে যে মূর্তির নির্মাণকাল চারশত বছর পূর্বের। কিন্তু তুলনামূলক ভাবে বলতে পারি, বর্ধমান ও বাঁকুড়া জেলার প্রাচীন জিনালয়গুলির নির্মাণকাল তা থেকে অনেক আগের। এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করার কারণ এই যে; এখানকার জিনালয়গুলির সংরক্ষক ও আরাধক ছিলেন সরাক সম্প্রদায়ের লোকেরা। আমার কাছে কিছু কিছু ছবি আছে তাতে পরিষ্কার লেখা আছে "সরাক জৈন মন্দির"। যদি সরাক সম্প্রদায় জৈন ধর্মাবলম্বী না হতেন তবে সরাক জৈন মন্দির লেখার হেতু

কী? ভেবে দেখুন। ভারতীয় ঐতিহাসিক, গবেষকগণ ছাড়াও পাশ্চাত্য দেশের অনেক গবেষক ঐতিহাসিক ভারতভ্রমণে এসে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাচীনতা, সংস্কার, রহন-সহন ইত্যাদি সম্পর্কে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। বিশেষ করে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকালে ইংরেজ গবেষক ই টি ডাল্টন, রিসলে, কুপল্যাণ্ড সাহেবের দেওয়া তথ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, সরাক সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাচীন জৈন পরম্পরার উত্তরাধিকারী। আমাদের দেশের অনেকে ঐতিহাসিক বা গবেষক হওয়ার শখে ঘরে বসেই আসল তথ্য সংগ্রহ না করেই কপি পেস্ট পদ্ধতিতে কিছু কথা পুঁথির পাতার লিপিবদ্ধ করে নাটকীয় ভঙ্গিতে নিজেকে জাহির করতে চেয়েছেন, এই রকম প্রমাণ আমার হাতে আছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ এ'রকম অপপ্রয়াসের পথে কখনও হাঁটেন নি। তার একটি মহাসত্য প্রমাণ ই টি ডাল্টন সাহেব তাঁর মানভূম জেলা ট্যুর ডায়েরীর পাতায় লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন, যখন তিনি পুরুলিয়া থেকে ১২ মাইল দূরে জুম্প্রাতে অবস্থান করছিলেন; সেই সময় সেখানে তাঁর সঙ্গে কয়েকজন স্থানীয় মানুষ সাক্ষাৎ করতে এসে নিজেদেরকে 'সরাক' বলে পরিচয় দেন এবং এও বলেন যে তারা ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থংকর ভগবান পার্শ্বনাথের উপাসক। ভগবান মহাবীরের বহু পূর্ব থেকেই তাঁদের সম্প্রদায় জৈন ধর্মে দীক্ষিত ছিল। এই ঘটনা ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দের। ডাল্টন সাহেব এও লিখে গেছেন যে, সাক্ষাৎকারীগণ একথাও ব্যক্ত করেন যে তাঁরা (সরাকরা) সম্পূর্ণ নিরামিষভোজী, এবং রাত্রিবেলায় ভোজন করেন না। ডাল্টন সাহেবের এই লেখা পড়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায় যে সরাক সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাচীন জৈন শ্রমণ ধর্মের উত্তরাধিকারী। কারণ জৈন শ্রমণ শাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে জৈন শ্রমণ ধর্মের উপাসকগণ নিশ্চিতরূপে নিরামিষ ভোজী এবং রাত্রি ভোজন করা এদের সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আশা করি বর্তমান সময়ে এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কিছু হয় না। এখানে জুম্প্রা গ্রাম সম্পর্কে কিছু না বললে আমার মতে কিছুটা শূন্যস্থান থেকে যায়। তাই এ বিষয়ে আমার অভিমত এখানে ব্যক্ত করা প্রয়োজন। আমার অনুমান, জুম্প্রা গ্রামটির আসল নাম ছিল জৈনপাড়া, জৈনপাড়া থেকে হয়েছে জুনপাড়া এবং তা থেকে জুম্প্রা, এবং পরবর্তী এর আত্মপ্রকাশ হয় ঝাঁপড়া নামে। আমি ১৯৭৪ খ্রিস্টাব্দে শ্রী সরাক জৈন সমিতির প্রধান প্রচারক হওয়ার সুবাদে সাইকেলযানে পুরুলিয়া ও বাঁকুড়া জেলার অনেক জায়গা ভ্রমণ করেছি। আমার ডায়েরীতে তার সমস্ত বর্ণনা লেখা আছে। সেই সময় ঝাঁপড়া গ্রামে আমার বিশেষ ভাবে একটি আশ্রয় হয়েছিল। ঐ গ্রামে তখন প্রায় দুইশত পঞ্চাশটি সরাক পরিবার বাস করত। আমি আশ্রয় পেয়েছিলাম শ্রদ্ধেয় কালিপদ মাজি মহাশয় ও বৈদ্যনাথ মণ্ডল মহাশয়ের বাসভবনে অতি আপন জনের মতো। এই দুই পরিবারের অনাদি প্রসাদ মাজি (শিক্ষক)

এবং কমলাকান্ত মন্ডল (প্রধান শিক্ষক, মধুতটী হাইস্কুল) মহাশয়গণের সঙ্গে আমার নিবিড় বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে উঠে। সেখানে আরেকজন বিশেষ বন্ধু পেয়েছিলাম; তিনি হলেন মকরন্দ মাজি মহাশয়।

কথা প্রসঙ্গে কমলাকান্ত বাবু একদিন বললেন যে, সরাক শব্দটির উৎপত্তি জৈন 'শ্রাবক' শব্দ থেকে। সরাক জাতি যে একসময় জৈন ধর্মাবলম্বী ছিল, তা সরাক শব্দটি থেকেই বোঝা যায়। তাছাড়া, তাদের আচার আচরণ ও রীতিনীতি প্রমান করে যে, সরাক সম্প্রদায় এককালে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিল। পুরুলিয়ার ন'ডিহা থেকে সুবোধ বসুরায় এবং আরো কয়েকজনের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ছত্রাক' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ ১৩৮০ সালের প্রথম তথা শারদীয়া সংখ্যায় এ বিষয়ে একটি সুন্দর লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি উক্ত পত্রিকার একটি কপি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন, যা আমার কাছে এখনো সুরক্ষিত আছে। পত্রিকাটি দেওয়ার সময় তিনি আমায় বলেছিলেন, কথিত আছে যে, পঞ্চকোটাধিপতি নীলমণি সিংহদেওয়ের রাজত্বকালে সরাক জাতি ব্রাহ্মণদের কাছ থেকে স্বীকৃতি লাভ করে এবং রাজপুরোহিত সরাকদের বাড়িতে পৌরোহিত্যের কাজ করা শুরু করেন। এটি ছিল সরাক সম্প্রদায়ের হিন্দু সমাজে অন্তর্ভুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

লিখিত এই সব তথ্য বাদ দিয়েও সরাক জাতির ইতিহাসের বিষয়ে মণ্ডল মহাশয়ের সাথে দীর্ঘ আলোচনা হয়। মণ্ডলবাবু এ'ও বলেন, সরাক জাতির লোকেরা অনেক প্রতিকূলতার মধ্যে অনেক চাপে পড়ে হিন্দু জনসমাজের অঙ্গীভূত হতে বাধ্য হয়েছিল। কারন জৈন সরাকদের আচারব্যবহার এবং তাঁদের প্রতিবেশী হিন্দুদের আচার ব্যবহারে প্রভূত পার্থক্য থাকায় সরাকরা এই অঞ্চলে সামাজিক দিক থেকে অবহেলিত ছিল। সরাকরা নিরামিষভোজী, রাত্রিভোজনত্যাগী এবং একমাত্র তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ভগবানের উপাসক হওয়ায় এখানকার মানুষজন সরাকদের উদ্দেশ্যে ঠাট্টা করে বলতেন, "সরাক! সকল জাতির ফারাক"। আরো অনেক অসহনীয় উপহাস তাঁদের শুনতে হত। সংখ্যাগুরুদের মধ্যে বসবাসকারী অহিংস ও শান্তিপ্রিয় সংখ্যালঘুদের এ'রকম পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া অস্বাভাবিক নয়। প্রকাশ থাকে যে, দিলীপ গোস্বামী দ্বারা সম্পাদিত 'পঞ্চকোটের ইতিহাস' থেকে জানতে পারা যায় যে, মহারাজ নীলমণি সিংহদেওয়ের রাজত্বকাল বাংলা ১২৫৮ সাল (১৮৫১ খ্রিস্টাব্দ) থেকে শুরু হয়েছিল, যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে রাজপদে অভিষেকের আগেই ১২৪৮ সাল থেকেই তিনি রাজকার্য দেখাশোনা করতেন।

প্রধানশিক্ষকের মতো গুরুদায়িত্বে অধিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি কমলাকান্তবাবুর কাছ থেকে প্রাপ্ত মৌখিক ও লিখিত তথ্যের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক।

এবার আসি আজ থেকে প্রায় একশত বছরের বেশি সময়ের কিছু কিছু উদাহরণে। এই সত্যের উদ্ঘাটন হয় উপাধ্যায় শ্রী জ্ঞানসাগর মহারাজের আশীর্বাদে। উপাধ্যায়শ্রীর আশীর্বাদধন্য আগ্রার মৈনপুরীর শ্রী সুশীল জৈন মহাশয়ের সম্পাদনায় ১২-১২-৯৫ তারিখে প্রকাশিত 'সরাক জ্যোতি' নামক পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় কিরীটিভূষণ সরাক দ্বারা লিখিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ধর্মবীর ও সরাকপ্রেমী বৈজনাথ সরাওগী এবং ব্রহ্মচারী শীতলপ্রসাদজী'র প্রয়াসে সরাক জাতি সম্বন্ধে বিস্তারিত তথ্য প্রথম আবিষ্কৃত, সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়। সেই সব তথ্য হরিয়ানা রাজ্যের পানিপথে অবস্থিত তৎকালীন বৃহত্তম জৈন গ্রন্থাগারে সুরক্ষিত রয়েছে। যে কোনো অনুসন্ধিৎসু সজ্জন বিষয়টি সেখানে গিয়ে যাচাই করলেই অনুধাবন করতে পারবেন যে, সরাক সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাচীন জৈন ধর্মাবলম্বীদের উত্তরাধিকারী এবং সেই উত্তরাধিকারের ধারা বর্তমন সময়েও চলমান। আবার, উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটাও স্পষ্ট হয় যে, সরাক জাতি সম্বন্ধে সুসংহত তথ্য লোকসমক্ষে প্রথম আনয়ন করে দিগম্বর জৈন সমাজ।

এরপর আসছি ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের একটি রোমাঞ্চকর ঘটনায়, যার উদ্ঘাটনকর্তা আমার অগ্রজতুল্য শিক্ষক ধানবাদ জেলার বেলুট গ্রামনিবাসী শ্রদ্ধেয় শ্রী অমরেন্দ্রনাথ সরাক মহাশয়। তাঁর প্রচেষ্টায় রূপনারায়ণপুর থেকে পন্যাসপ্রবর সরাকরত্ন (বর্তমানে আচার্য) শ্রী সুযশ মুনি মহারাজের আশীর্বাদধন্য একটি পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে, যার নাম 'সরাক সংস্কৃতি'। পত্রিকাটির সম্পাদকমণ্ডলীর নেতৃত্বে ছিলেন বর্ধমান জেলার মদনতোড় গ্রামনিবাসী শ্রী সমীর কুমার মাজি মহাশয়। উক্ত পত্রিকার প্রথম বর্ষের দশম (চৈত্র ১৪৩২) সংখ্যায় "সরাক জাতির উত্থানের অগ্রদূত" শিরোনামে অমরেন্দ্রবাবুর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি যা লিখেছিলেন, তাঁর সারমর্ম এই যে, সুদূর গুজরাট প্রদেশ থেকে উপাধ্যায় ন্যায়রত্ন ন্যায়বিশারদ শ্রদ্ধেয় শ্রী মঙ্গলবিজয়জী মহারাজ এবং তাঁর শিষ্য যুবামুনি শ্রদ্ধেয় শ্রী প্রভাকরবিজয়জী মহারাজের পদার্পণ হয় সরাকক্ষেত্রে । পাবাপুরী তীর্থক্ষেত্রে চাতুর্মাসে অবস্থানকালীন গুরুশিষ্যের মনে এই প্রশ্ন জাগে যে শাশ্বত তীর্থক্ষেত্র মহাপবিত্র সম্মেদশিখরজী, যার ধারে কাছে কোনো জৈন সম্প্রদায়ের প্রাচীন বসতি নেই, তাঁর মূল সংরক্ষক ও উপাসক কারা? কারা হাজার হাজার বছর ধরে এই মহাতীর্থের পালন পোষণ করে রক্ষা করে আসছেন? প্রবচন প্রসঙ্গে পাবাপুরী তীর্থে এক প্রবচনসভায়

কোলকাতার গড়িয়াহাট নিবাসী বাহাদুর সিং সিংভী মহাশয় সন্তদ্বয়ের অন্তরমনের ঐ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেন। তাঁর উত্তর শুনে ঐ সভায় মঙ্গলবিজয়জী প্রতিজ্ঞা করেন যে, সরাক জাতির স্বধর্ম পুনরুদ্ধারের জন্য তিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন। গুরুশিষ্য এই দুই মহাত্মা প্রকৃত অর্থেই সরাকদের মধ্যে হারানো উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।

দিগম্বর সমাজের আচার্য পরমপূজ্য আচার্য শ্রী বিদ্যাসাগর মহারাজের আশীর্বাদ লাভে যেমন আমি ধন্য হয়েছিলাম, তেমনই শ্বেতাম্বর মুনি পরমপূজ্য শ্রীপ্রভাকরবিজয়জীর সান্নিধ্য ও বাৎসল্য লাভের দুর্লভ সৌভাগ্যও আমার হয়েছিল। এঁরা বারবার বিভিন্ন প্রবচনে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সরাক সম্প্রদায়ের লোকেরা সম্পূর্ণ রূপে প্রাচীন জৈন ধর্মের জীবিত প্রতীক। আমার অন্তরে এই সমস্ত জৈন সন্তগণের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা জাগে, যখন দেখি সরাকবহুল অঞ্চলে শ্রী মঙ্গলবিজয়জী ও তাঁর শিষ্য শ্রী প্রভাকরবিজয়জী শত সহস্র কষ্ট অসুবিধা এবং বিপরীত পরিস্থিতিকে হাসিমুখে বরণ করে নিয়ে সরাক জাতিকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস চালিয়ে নিজেদের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞানে উৎসর্গ করে গেছেন। আমিও সরাক কুলে জন্ম নিয়ে আমার এই মানবজন্ম ধন্য মনে করি। সরাক কুলে জন্মগ্রহণের কারণেই আমি বহু সাধু মহাত্মা ও বিদ্বজ্জনদের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি, যাঁদের সান্নিধ্য লাভ আমাকেও শিখিয়েছে যে, বাস্তবিক পক্ষে জৈন শ্রমণ ধর্ম আমার নিজস্ব ধর্ম; আমার জীবনরথের জন্য প্রশস্ত ও সঠিক পথ।

সরাক সম্প্রদায়ের লোকেরা যে প্রাচীন জৈন শ্রমণ ধর্মের উত্তরাধিকারী, সেই বিষয়টিকে সম্বল করে আজ সরাক সমাজের কিছু কিছু দুর্বলতাকে সবল করার জন্য জৈন দিগম্বর সমাজ ও জৈন শ্বেতাম্বর সমাজের ধর্মপ্রেমী সরাকদরদী ও জ্ঞানী সন্তগণ এবং অনুভবী শ্রাবকগণ এগিয়ে এসে সরাকবসতিবহুল গ্রামে গ্রামে মন্দির ও জিনালয় নির্মাণ করিয়ে তাঁদের শুভ প্রচেষ্টা করে চলেছেন এবং সেইসঙ্গে কিছু বাস্তবিক অসুবিধা দূরীকরণের চিন্তাভাবনাও করে চলেছেন। আজকের দিনে সেগুলোর কি কোন মূল্য নেই? অন্ধকার থেকে আলোর দিকে এতটা পথ এগিয়ে চলার পরও কি কেউ প্রশ্ন তুলবেন যে, সরাক সম্প্রদায়ের লোকেরা কি জৈন? আমি নিজের মন থেকে বিকল্পহীন একটি প্রশ্ন সকল সরাক পূজ্যজনের কাছে, শহর, নগর, গ্রাম ও গঞ্জে বসবাস করা আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে এবং সকল বোধশক্তিসম্পন্ন সজ্জনের কাছে সনির্বন্ধ প্রার্থনা করছি, আজ যখন আমাদের শুভক্ষণ আগত, তখন এই শুভক্ষণকে কাজে লাগাবার সুযোগ থেকে কেউ নিজেকে বঞ্চিত না করে মাথা উঁচু করে এগিয়ে আসুন; সগর্বে সর্বসমক্ষে নিজের গৌরবময়

ঐতিহ্যকে উপস্থাপন করুন। প্রাচীন ঐতিহ্য-সৌন্দর্যের গর্বে আজও গর্বিত সরাক সম্প্রদায় নিজেদের শ্রাবকোচিত বিধিবিধানকে যেন হারিয়ে যেতে না দিই; যেন বিস্মৃত না হই।

নিদ্রা থেকে জেগে ওঠ যতেক সরাক বন্ধু।
নজাগরণের আলোক পেয়ে তরব ভবসিন্ধু।
তীর্থঙ্করদের দেখানো পথেই গড়ব জীবন।
রত্নত্রয়ে ঋদ্ধ হোক মোদের আচরণ।
স্বধর্ম ছেড়ো না, কভু ডাকেও যদি মরণ।।
মনীষীদের বাণী হোক মোদের অবলম্বন।
স্বধর্মে নিধন শ্রেয় পরধর্ম ভয়ঙ্কর।
স্বধর্ম পালনে স্বর্গ বানাও আপন ঘর।।

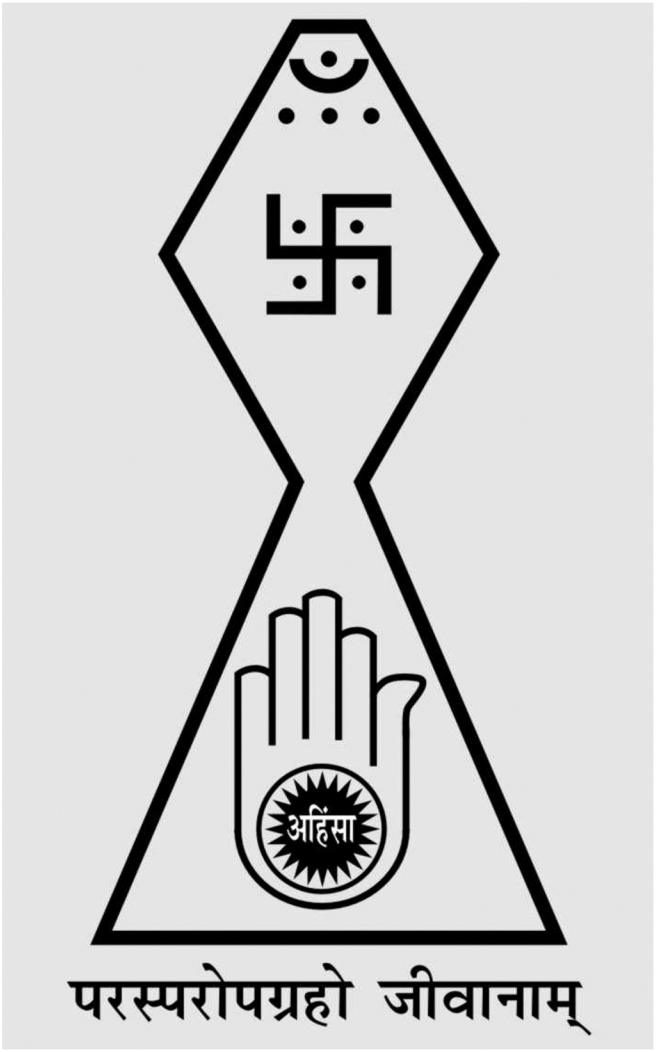

বাঁকুড়ার ইঁদপুর পরিমণ্ডলে কয়েকটি জৈন প্রত্নস্থল : একটি ক্ষেত্রানুসন্ধান

- **সুমিত মহন্ত**

বাঁকুড়া জেলার একটি ব্লক ও থানা হল ইঁদপুর। অনার্য ও আর্য শব্দের মিলনে ইঁদপুর নামটির জন্ম। 'ইঁদ' মানে শালগাছ যাকে আদিবাসীরা দেবতা মনে করে। এটি একটি অস্ট্রিক শব্দ এবং 'পুর' নামক তৎসম শব্দটির অর্থ জনপদ । পূর্বে এই স্থানে ইঁদ নামক বৃক্ষপূজা ও ইঁদপরব হত সেখান থেকে ইঁদপুর নামটি এসেছে।[১] ১৮০৫ সালের আগে ইঁদপুর ছিল আমায়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। পরবর্তীকালে ইঁদপুর প্রথম জঙ্গলমহল ও পরবর্তীকালে মানভূম জেলার অধীন ছিল।[২] এই ব্লকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে শিলাবতী, অড়কষা, জয়পন্ডা তিনটি নদী। শিলাবতী নদীপথে মানভূম থেকে জৈনরা বাঁকুড়া এসেছিল। এই নদী তীরবর্তী গ্রাম গুলিতে গড়ে উঠেছিল জৈন প্রত্নস্থল। প্রাক ইসলামিক যুগে ইঁদপুর বর্বর আদিম জনজাতি ও জৈনদের কেন্দ্র ছিল। দ্বিতীয় খ্রিস্টাব্দ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ইঁদপুর জুড়ে ভূমিজ সভ্যতা ও জৈন ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল। [৩] ইঁদপুর ব্লক ৩০২.৬০ বর্গকিমি এলাকা জুড়ে অবস্থিত। এই ব্লকের মোট ২২২ টি মৌজা রয়েছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, এই এলাকায় প্রথম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত জৈন ধর্ম এখানকার প্রধান ধর্ম ছিল।[৪] সমগ্র ব্লকের সামগ্রিক আলোচনার পরিবর্তে এই ব্লকের কিছু গুরুত্বপূর্ণ জৈন প্রত্নস্থল নিয়ে আলোচনা করা হল।

জোড়দা:

বাঁকুড়া জেলার শিলাবতী নদীর উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ৭ কি.মি. দূরে ইন্দপুর-বাংলা ম্যান রোডের গায়ে জোড়দা গ্রামটি (J.L.No- 46) অবস্থিত। এই গ্রামটি বাঁকুড়া শহর থেকে দক্ষিণে ৩২ কি.মি. দূরে অবস্থিত। পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চা থানার পাকবিড়রা থেকে মানভূমের ভাষা আন্দোলনকারীরা পায়ে হেঁটে কলকাতার পথে গমনকালে জোড়দা ছিল দ্বিতীয় স্টপেজ। ১৯৫৬ সালে ২০ এপ্রিল সকাল ১১ টায় টুসু সত্যাগ্রহীরা এই গ্রামে পৌঁছায়।[৫] এই ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পাকবিড়রার জৈন বেষ্টনীর মধ্যে জোড়দা গ্রাম পড়ে। জোড়দার ডানদিকে শিলাবতী, বামে অড়কোশা এবং কিছু দূরে দ্বারকেশ্বর নদী প্রবাহিত।[৬] এই গ্রামটি দক্ষিণ বাঁকুড়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে এই স্থানের উল্লেখ থাকলেও তেমন বিস্তারিত আলোচনা হয়নি।

ব্রহ্মা মন্দির:

এই পল্লীর উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে সুপ্রাচীন তেঁতুল ও কুসুম গাছের ছত্রছায়ায় একটি নবনির্মিত দেবস্থান যা লোকমুখে ব্রহ্মাথান নামে সুপরিচিত। আটচালার পাশে নবনির্মিত মন্দিরের খাপে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বেশ কিছু মূল্যবান মূর্তি। এই প্রত্নস্থল সম্পর্কে 'Archaeology of Bankura' ASI report (A.D.1300) থেকে জানা যায় –" The images found at the site are a chatrumukha siva lingam, two Visnu images and an images of Tirthankara parsvanath. Besidses, there are other fragements of sculptures having bearing upon different religious faiths." [৭] আমরা উক্ত মূর্তি গুলো নিয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করলাম। ব্রহ্মা থান মন্দিরের গাত্রে একটি জৈন বীরস্তম্ভ মূর্তি রয়েছে লোকে হনুমান রূপে তাকে পূজা করেন। এই মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ১ ফুট ৮ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১১ ইঞ্চি। এছাড়া বিষ্ণু মূর্তি এবং মন্দিরের গর্ভগৃহে একটি বিরল চতুর্মুখি শিব লিঙ্গ রয়েছে।

শিব মন্দির

আটচালার ডান পাশে, ব্রহ্মাথানে প্রবেশ করার সম্মুখে নব নির্মিত গম্বুজাকৃতি শিব মন্দিরটি অবস্থিত। আটচালা বিশিষ্ট এই মন্দিরটির দক্ষিণমুখী এবং একটি প্রবেশদ্বার রয়েছে। মন্দিরের খিলান অনেকটা তিন কেন্দ্রিক খিলানের মতো দেখতে হলেও এর আকৃতি অনেকটা উল্টানো আয়তক্ষেত্রের মতো। এই মন্দিরের ভেতরে একটি গর্তে শিব লিঙ্গটি বিদ্যমান। শিব লিঙ্গটি প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমান কারণ এতে গৌরীপট্ট নেই। পুরাণ অনুযায়ী এই ধরনের লিঙ্গকে স্বয়ম্ভূ-লিঙ্গ বলা হয়। প্রাচীন শাস্ত্রে এই ধরনের লিঙ্গকে দেব লিঙ্গ বলে। মন্দিরের গাত্রে জৈনদের তেইশতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ মূর্তিটি ত্রিস্তরিয় পদ্ম পাতার উপরে কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় বিরাজমান। পুরাতাত্ত্বিকদের ধারনা এটি একাদশ থেকে দ্বাদশ শতকের জৈন মূর্তি। এই ধরণের সপ্তফেনা বিশিষ্ট মূর্তি নির্মাণ কুষাণ আমল থেকে শুরু হয় এবং দ্বাদশ শতক পর্যন্ত এই রীতি চলতে থাকে।[০৮] কুষাণ আমলে এই ধরণের মূর্তি মথুরাতে পাওয়া যায়। [০৯] তীর্থঙ্কর মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ২ ফুট ও প্রস্থ হল ১ ফুট ৩ ইঞ্চি। মূর্তিটির আজানুলম্বিত বাহু, মস্তকে রত্নখচিত মুকুট, আকর্ণ বিস্তৃত। মুকুটের নিম্নাংশ কর্ণ পর্যন্ত আচ্ছাদিত। সামান্য জ্যোতির্বলয়। মস্তক শীর্ষে চালচিত্রের একটা বিরাট অংশ জুড়ে সপ্তফনার সর্প ছত্রটি দেবতাকে সমস্ত অশুভ

শক্তি থেকে রক্ষা করছে। দেবতার পাদপীঠ থেকেই উভয় পার্শ্বে কয়েলের মত জড়ানো কুণ্ডলীকৃত সর্পদেহ উভয় স্কন্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। [১০] মূর্তিটির মস্তকের দুপাশে উড্ডীয়মান বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী। মূর্তির দুই পাশ জুড়ে রয়েছে চারটি দণ্ডায়মান জৈন সেবক মূর্তি। মন্দিরের বাম দিকের গাত্রে রয়েছে আরেকটি অপূর্ব সুশোভিত স্বর্ণমুকুট পরিহিত এক দেব মূর্তি। মূর্তিটি সম্ভবত বৌদ্ধ ধর্মের কোন পুরুষ দেবতার। মূর্তিটির দৈর্ঘ্য ৩ ফুট ২ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১ ফুট ৮ ইঞ্চি। দেবমূর্তিটি দণ্ডায়মান এক অপরূপ শ্রী নিয়ে; মূর্তির কণ্ঠে অলঙ্কার, শুভ্র ধুতি ও অপূর্ব সুন্দর উপবীত পরিহিত, অস্ত্র হীন দুটি বাহু বৈচিত্র্যময়য় বাহুবন্ধনি অলঙ্কারে সুশোভিত। এর বাম ও দক্ষিণ এই দুই পাশে উড্ডীয়মান বিদ্যাধর। মূর্তিটি শিল্পত্ব অতীব হৃদয়গ্রাহী। শিব মন্দিরের গাত্রে আরেকটি মূর্তি রয়েছে। পুরাতাত্ত্বিকদের মতে এটি একটি বিষ্ণুমূর্তি। এর দৈর্ঘ্য ২ ফুট ১০ ইঞ্চি ও প্রস্থ ১ ফুট ৫ ইঞ্চি। বিষ্ণুমূর্তিটি দ্বিস্তরীয় পদ্মের ওপর অধিষ্ঠিত। মূর্তিটি চতুর্ভুজা। অগ্নিপুরাণ অনুযায়ী বিষ্ণুর ডান হাতে ওপরে চক্র এবং নীচে পদ্ম, বাম হাতে গদা ও শঙ্খ বিদ্যমান।[১১]

মন্দিরের একটি গাছের তলায় খিলানের খণ্ড, আমলক এবং একটি বর্গাকার আয়াগপট্ট ছড়িয়ে রয়েছে। আলোচিত মূর্তি গুলির ঐতিহাসিক গুরত্ব অপরিসীম কারণ এগুলো পাল আমলের পূর্বে গুপ্ত যুগে নির্মিত বলে অনুমান করেছেন গবেষকগণ। অতএব জোড়দা গ্রামটি যে বাঁকুড়া জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তি নিয়ে বহু শতাব্দী জুড়ে দণ্ডায়মান সে কথা আজ কতজনের বিদিত আছে ?

জুনবেদিয়া:

শিলাবতী বাম তীরে জুনবেদিয়া (J.L.No- 66) গ্রামটি অবস্থিত। শিলাবতীর নদীতীরে বহু প্রাচীন কাল থেকে মানব সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। শিলাবতী অববাহিকায় সঞ্চিত রয়েছে আর্কিয়ান যুগের নিস নামে এক রূপান্তরিত শিলার স্তর। শিলার প্রাচুর্যের জন্য নদীর নাম শিলাবতী।[১২] জুনবেদিয়া গ্রামটি ইন্দপুর ব্লকের অন্তর্গত হলেও হিড়বাঁধ ব্লকের শেষ সীমা শিলাবতীর তীরে উল্লেখযোগ্য প্রত্নস্থল বলে প্রাসঙ্গিক ভাবে আলোচনার দাবী রাখে। ইন্দপুর থেকে ১৫ কিমি দক্ষিণ পশ্চিমে ইন্দপুর-মলিয়ান ম্যান রোডের গায়ে জুনবেদিয়া গ্রামটি অবস্থিত। এই গ্রামের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রত্নস্থলটি রয়েছে। শিলাবতীর বাম তীরে নদী থেকে প্রায় ১০০ ফুট উঁচুতে একটি প্রাচীন মন্দিরের অবশিষ্টাংশ প্রাপ্ত যার আয়তন প্রায় ৫০০ স্কয়ার ফুট। এখানে উঁচু ঢিবির ওপর ইটের

গাঁথুনি আর কয়েকটি ভাঙা ইমারতের চিহ্ন রয়েছে। এই প্রত্নস্থল সম্পর্কে 'Archaeology of Bankura' ASI report (A.D.1300) থেকে জানা যায় – "In the center of the Temple there is a whole or chamber called the garbhakunda. Some small pieces of stone images are lying in a row around the garbhakunda. Among these sculptural pieces, the image of Ganesa and the dhyani image of a Tirthankara may be identified."[১৩] স্থানীয়রা এই মন্দিরকে বুদ্ধ মন্দির বলেন। প্রাপ্ত মূর্তিগুলোকে বৌদ্ধ মূর্তি বলে ভুল করেছেন গ্রামবাসী। আমাদের অনুমান ধ্যানরত অবস্থায় যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তিটি হল ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের। jaina iconography অনুযায়ী ঋষভনাথ, নেমিনাথ, মহাবীর এই তিনজন তীর্থঙ্কর ধ্যানরত অবস্থায় পদ্মর ওপর উপবিষ্ট। বাকি তীর্থঙ্করগণ দাড়িয়ে। এই ধ্যানমুদ্রায় মহাবীরের মূর্তিটি গুপ্ত অথবা গুপ্ত পরবর্তী যুগের হতে পারে। কারণ কালো ক্লোরাইডের এই মূর্তিটি প্রস্ফুটিত বিশ্বপদ্মের ওপর ধ্যানরত, মূর্তির আশেপাশে কোথাও কোন বিদ্যাধর- বিদ্যাধরী, নবগ্রহ, শাসনদেবতা-দেবী অনুপস্থিত। কুষান আমল থেকেই মহাবীরের প্রাচীনতম মূর্তি নির্মাণ শুরু হয়।[১৪] মথুরা শুঙ্গ-কুষান শিল্প রীতির জৈনমূর্তিতে শ্রীবৎস চিহ্ন এবং ধ্যানমুদ্রার প্রবর্তন হয়। দশম থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত সময় থেকে জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তিতে প্রতীক চিহ্নাদি, ধর্মচক্র, নির্দিষ্ট যক্ষ ও যক্ষিণী এবং তাঁদের প্রতীক বৃক্ষাদি চিহ্নিত করে উৎকীর্ণ করা হত।[১৫] আলোচ্য যোগাসনে উপবিষ্ট মূর্তিটির দুটি কর্ণ আচ্ছাদন করেছে অপূর্ব কর্ণকুণ্ডল। বুকে শ্রীবৎস চিহ্ন। মূর্তির প্রভামণ্ডল দিব্য জ্যোতির্ময়। সিঁদুর লেপনের ফলে লাঞ্ছন চিহ্ন বোঝা কষ্টকর। তাই জোর দিয়ে বলা যায় না এই মূর্তিটি যে গুপ্ত বা তার পরবর্তী যুগের মহাবীরের। ধ্যানী মূর্তির পাশে রয়েছে বেশ কিছু ভগ্ন জৈন মূর্তি। এছাড়া জৈনযুগের পূজিত একটি গণেশ মূর্তি রয়েছে। জৈনরা যে গণেশ পূজা করে তার বহু প্রমাণ মেলে বাঁকুড়া জেলার নদী তীরবর্তী প্রত্নস্থল গুলিতে। এ প্রসঙ্গে B.C.Bhattacharya র বিবৃতিটি স্মরণযোগ্য- " In the images of Gnesha, Srikubera, Indra . The long standing traditions and well-established images of these Gods in Brahmanism directly appealed to the Jains... " (The Jaina Iconography/ B.C.Bhattacharya) [১৬] ব্রাহ্মন্যধর্মের বহু দেবতা সে যুগে জৈন ধর্ম জীবনে অনুপ্রবেশ করেছিল।[১৭]

টুঙ্গি (J.L.No- 041):

এই গ্রামের মধ্যস্থলে কিছু ভগ্ন জৈন মূর্তি আছে। কোথাও লাঞ্ছন চিহ্ন স্পষ্ট নয় বলে এদের চিহ্নিত করা মুশকিল। তবে ক্লরাইট পাথরে নির্মিত মূর্তি গুলি জৈন তীর্থঙ্কর এবং যক্ষিণী মূর্তি তাতে সন্দেহ নেই। এগুলি আনুমানিক দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্মিত।

জিওড়দা (J.L.No- 105):

বাঁকুড়া – খাতড়া সড়কপথে অবস্থিত ডাঙ্গারামপুর থেকে গ্রামের দূরত্ব ৪ কিমি। গ্রামের শেষ প্রান্তে রয়েছে সাঁকা সিনি থান। একটি সুপ্রাচীন বটবৃক্ষের তলায় পোড়া মাটির হাতি ঘোড়ার সঙ্গে একটি সপ্তফেনা সুশোভিত পার্শ্বনাথ মূর্তি রয়েছে। তার মাথার ওপর দুদিকে বিদ্যাধর-বিদ্যাধরী মালা হস্তে উড্ডীয়মান। এখানে আরেকটি জৈন মূর্তি ছিল কিন্তু তা চুরি হয়ে গিয়েছে বলে গ্রামবাসীদের ধারনা।

ফুলকুসমা:

ফুলকুসমা গ্রামে (J.L.No- 071) হরি মন্দিরের পাশে একটি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি রয়েছে। এটি আদি তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের মূর্তি। লাঞ্ছন চিহ্ন ষাঁড়। প্রস্ফুটিত পদ্মের ওপর কায়োৎসর্গ ভঙ্গিমায় দণ্ডায়মান। মূর্তির দুপাশে রয়েছে সারিবদ্ধভাবে তিনটি করে মোট ২৪ জন তীর্থঙ্কর মূর্তি। তীর্থঙ্কর মূর্তির নীচে রয়েছে দুই চামর ধারী পুরুষ জৈন সেবক। মূর্তির উপরিভাগ ভগ্ন। শুধু কোমরের নিম্নভাগ সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়।

জুগীবাইদ:

যোগী অপভ্রংশ হল যুগি। সেই থেকে জুগি নামটি এসেছে। বাঁকুড়াতে বাইদ শব্দের অর্থ হল উঁচু জায়গা যেখানে জল জমে না। এই যোগীরা ছিল শৈব এবং তাদের পদবী নাথ। এই এলাকায় শৈবরা জৈন ধর্মকে স্বাগত জানিয়েছিল। জনশ্রুতি অনুযায়ী এই জনশূন্য জুগিবাইদ মৌজায় (J.L.No- 075) জৈন মূর্তি ও মন্দিরের আমলক শিলা পাওয়া গিয়েছে। তবে এই মৌজাটি জনবসতিহীন। বর্তমানে কোন মন্দির বা মূর্তি আমাদের চোখে পড়েনি।

সোনারডাঙ্গা:

জনশ্রুতি অনুযায়ী সোনারডাঙ্গা গ্রামে (J.L.No- 074) একটি জৈন যুগের হিরোস্টোন

আগে পূজিত হত। কিন্তু আমরা সমীক্ষা করে তেমন কোন মূর্তি খুঁজে পাইনি। সম্ভবত তা কোনভাবে চুরি হয়েছে নচেৎ অবহেলায় তা লোকালয় থেকে দূরে কোথাও পড়ে রয়েছে।

পাঁচপোখরিয়া:

ভেদুয়াশোল গ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত পাঁচপোখরিয়া (J.L.No-110) গ্রামে একাধিক দেউল ছিল। গ্রামের প্রান্তে ভাঙা মন্দিরে রক্ষিত আছে ভগ্ন সপ্তফেনা বিশিস্ট একটি জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি । আমাদের অনুমান এটি পার্শ্বনাথের মূর্তি। মূর্তি ছাড়া মন্দিরের আমলক শিলাস্তম্ভ, মন্দিরের খিলানের অংশ পড়ে রয়েছে। আমাদের ধারনা সুদূর অতীতে এটি একটি জৈন মন্দির ছিল।

গোবিন্দপুর:

শিলাবতীর তীরে গোবিন্দপুরে (J.L.No- 160) একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষা কালে কোন মূর্তি মেলেনি। অনুমান করা যায় এখানে প্রাচীনকালে জৈন মন্দির ছিল। কারণ এই শিলাবতী উপত্যকা জুড়ে প্রাচীন কালে এক বৃহৎ জৈন সভ্যতা গড়ে উঠেছিল।

নামো কেচন্দা:

শিলাবতীর গা ঘেঁসে অবস্থিত একটি ক্ষত্রিয় গ্রাম হল নামো কেচন্দা (J.L.No- 162)। এই গ্রামে ধ্বংস স্তুপের কাছে রাস্তা নির্মাণের সময় তিনটি জৈন মূর্তি জনৈক গ্রামবাসী উদ্ধার করেছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল পার্শ্বনাথের মূর্তি।[১৮] বর্তমানে কোন মন্দির বা মূর্তির কোন চিহ্ন পাওয়া গেল না ক্ষেত্রসমীক্ষায়। তবে এই গ্রামে শক্তির আরাধনা আছে।

ভেদুয়াশোল:

শিলাবতীর তীরে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম হল ভেদুয়াশোল (J.L.No- 152)। এই গ্রামের শিবমন্দিরে প্রাচীন মন্দিরের দুটি মঙ্গল কলস ছিল। গবেষকগণ মনে করেন এই গ্রামে উড়িষ্যা রীতির একটি রেখ দেউলের অস্তিত্ব ছিল।[২১] আমাদের অনুমান এখানে প্রাচীনকালে জৈন মন্দির ছিল।

বলরামপুর:

বাঁকুড়া–পুরুলিয়া **মেইন** রোডের পাশে শালডিহা কলেজের ১ কিমি আগে অবস্থিত বলরামপুর গ্রাম (J.L.No- 052)। একটি শিব থানে পোড়া মাটির হাতি ঘোড়ার পাশে স্থান পেয়েছে একটি জৈন চৌমুখ বা চৈত। ব্যসাল্ট শিলায় নির্মিত এই চৌমুখ স্বতন্ত্র ধরনের। চারটি খাপে ধ্যানমুদ্রায় বসে রয়েছেন চারজন তীর্থঙ্কর মূর্তি। প্রায় ১ ফুট দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ ১ সেমি। প্রত্যেকে জোড় হস্তে উপবিষ্ট। মস্তক সুশোভিত বিচিত্র অলংকারে। পাদপীঠে লাঞ্ছন চিহ্ন অস্পষ্ট বলে কোন জৈন তীর্থঙ্কর বোঝা মুশকিল।

দেউলভিড়া:

দেউলভিড়া (J.L.No- 135) গ্রাম প্রবেশের মুখেই কুচলা গাছের নিচে একটি দেউলের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে। দেউল মানে মন্দির। প্রাচীন মন্দিরের উপস্থিতি দেউল যুক্ত গ্রাম নামে দেখা যায়। বাঁকুড়া জেলায় তিনটি দেউলভিড়া নামের গ্রাম রয়েছে। আমরা তিনটি গ্রামেই জৈন প্রত্নস্থলের সন্ধান পেয়েছি। ভিড়া শব্দটি সম্ভবত ভিড় অর্থাৎ অজস্র বোঝাতে ব্যবহৃত। একাধিক দেউলের অস্তিত্ব বোঝাতে ভিড় থেকে ভিড়া শব্দটি এসেছে। কারণ স্থান গুলিতে একটি মন্দিরের অস্তিত্ব থাকলেও একাধিক মূর্তি ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় জানা যায়, প্রায় ৩০০ বছর আগে কেউ একজন জৈন ধর্ম প্রচারক দেউল নির্মাণ করেন। তবে বর্তমানে কয়েকটি মাকড়া পাথর ও আমলক শিলা পড়ে রয়েছে। স্থানীয়দের মতে, এখানকার কয়েকটি মূর্তি চুরি হয়ে গিয়েছে। মন্দিরে দুতিনটি ভগ্ন জৈন মূর্তি উদ্ধার হয়েছিল যা প্রশাসনের সহযোগিতায় খাতড়া মহাফেজখানায় সংরক্ষিত রয়েছে।[১৯]

জিড়রাঃ

জিড়রা গ্রামে (J.L.No- 113) বেশ কিছু জৈন মূর্তি ছিল বলে স্থানীয় সূত্রে খবর।

উপসংহার:

এই এলাকার জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি গুলি কুশান আমলের বাঁধাধরা শৈলীতে নির্মিত। দক্ষিণ ভারত এবং পূর্ব ভারতের থেকে স্বতন্ত্র এই ব্লকের মূর্তির শিল্পকলা উড়িষ্যার অনুরূপ। মানভূম অঞ্চলের তীর্থঙ্কর মূর্তিগুলির হুবহু অনুকরণ ও অনুসরণ করেছেন এই ব্লকের মূর্তি নির্মাণের শিল্পী ও কারিগরেরা। মোটামুটি সমগ্র দক্ষিণ বাঁকুড়া ও মানভূমের সমগ্র অঞ্চলে একই ধরনের শিল্পরীতি

পরিলক্ষিত হয়েছে। যে সব গ্রাম নামে 'ড়া' বা 'দেউল' শব্দ রয়েছে সেখানে জৈন প্রত্নস্থল থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এই ব্লকের অনেক গ্রামে পূর্বে প্রচুর জৈন তীর্থঙ্কর মূর্তি এবং মন্দির ছিল কিন্তু বর্তমানে তার অধিকাংশ চুরি হয়েছে কিম্বা জলাশয়ে ডুবে গেছে না হয় মাটির ভেতরে নির্বাসিত হয়েছে। কিছু মূর্তি সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করা হয়েছে। যে বৃহৎ জৈন সভ্যতা একদা গড়ে উঠেছিল হিন্দু ধর্মের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এই গ্রাম গুলির বুকে আনুমানিক পাল- সেন যুগে,সেই বৃহৎ জৈন ধর্ম ও সভ্যতা কীভাবে অস্তগামী হল সে প্রশ্ন আমাদের মনে জাগ্রত রইল। শুধু তাই নয়, বৌদ্ধ ধর্মের কোন পাথুরে প্রমাণ না পাওয়া গেলেও তার সাহিত্যিক নিদর্শন চর্যাপদ পাওয়া গেল নেপালে। অথচ আমদের বাঁকুড়া- পুরুলিয়া জেলায় জৈন মন্দির ও মূর্তির এমন সমাগম থাকা সত্ত্বেও কেন জৈন ধর্মের কোন সাহিত্যিক নিদর্শন পাওয়া গেল না এই প্রশ্নটিও উত্থাপন করলাম। বর্তমানে গবেষণার পরিধি ও পরিসর বেড়েছে আশা রাখব একদিন এই প্রশ্নের উত্তর আমরা একদিন নিশ্চয় খুঁজে পাব।

তথ্যসূত্রঃ

১। চট্টোপাধ্যায় অরবিন্দ- ইঁদপুর ব্লকের ইতিবৃত্ত(প্রবন্ধ), কাঁসাই-কুমারী, সম্পাদক- ডঃ বাবুলাল মাহাত ও প্রকাশ দাস বিশ্বাস, মহকুমা শাসকের কার্যালয়, খাতড়া, বাঁকুড়া , প্রথম প্রকাশ- জানুয়ারি, ২০১৪, পৃষ্ঠা- ০৩।

২। কর সমীর কুমার - প্রসঙ্গ ইন্দপুর। বাঁকুড়ার খেয়ালী- সম্পাদক –গিরিন্দ্র শেখর চক্রবর্তী। সংকলন ২০১৪, বিষয় জঙ্গলমহল, ১৬২ বি কুচকুচিয়া রোড, বাঁকুড়া- ৭২২১০১, পৃষ্ঠা- ৭২।

৩। প্রাগুক্ত- অরবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা- ৮-৯। ৪। দক্ষিণ- পশ্চিম বঙ্গের শিল্প। প্রবাসী, মাঘ, ১৩৩৭। পুনর্মুদ্রণঃ ইতিহাস চিন্তা, পৃষ্ঠা- ১৭৮।

৫। গোস্বামী দিলীপ কুমার। মানভূমের ভাষা আন্দোলন ও পুরুলিয়ার বঙ্গভুক্তি। পুনর্মুদ্রণ- ১৯ জানুয়ারি ২০০৭। বজ্রভূমি প্রকাশনী, বিদ্যাসাগর পল্লী, বাঁকুড়া। পৃষ্ঠা- ১০৫।

৬। বন্দ্যোপাধ্যায় সুকুমার- রাঢ় বাঙলায় জৈন অবশেষ – বাঁকুড়া জেলা পর্ব। প্রথম প্রকাশ – কলকাতা বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, আনন্দ প্রকাশন, সি-৮, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট (দ্বিতল) , কলকাতা- ৭০০০০৭, সম্পাদনা- সুশীলকুমার বর্মণ। পৃষ্ঠা- ১৩৪।

৭। 'Archaeology of Bankura'- chapter VII TILL C.AD. 1300, ASI, Calcutta, page no- 249।

৮। ৭। মণ্ডল কৃষ্ণকালী। সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি ভাস্কর্য । প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর, ২০১০, নব চলন্তিকা। পৃষ্ঠা- ২২৭।

৯। প্র. তিবারি মারুতি নন্দনপ্রসাদ। জৈন প্রতিমা বিজ্ঞান। প্রথম প্রকাশ- ২০২২। পার্শ্বনাথ বিদ্যাপীঠ, বারাণসী- ২২১০০৫। পৃষ্ঠা- ১২৩।

১০। মণ্ডল কৃষ্ণকালী। সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি ভাস্কর্য । প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর, ২০১০, নব চলন্তিকা। পৃষ্ঠা- ২২৯।

১১ । Haque Enamul , Bengal Sculpture, publish- 1992, Dhaka, Bangladesh National Museum, page- 45.
১২। সিংহ মহাপাত্র রামামৃত- শিলাবতী উপত্যকার লোকায়ত প্রত্নজীবন। সম্পাদনা-শতঞ্জীব রাহা। প্রথম প্রকাশ- বইমেলা, ২০২০ ,পৃষ্ঠা- ১২।
১৩। 'Archaeology of Bankura'- chapter VII TILL C.AD. 1300, ASI, Calcutta, page no- 249
১৪। প্র. তিবারি মারুতি নন্দনপ্রসাদ। জৈন প্রতিমা বিজ্ঞান। প্রথম প্রকাশ- ২০২২। পার্শ্বনাথ বিদ্যাপীঠ, বারাণসী- ২২১০০৫। পৃষ্ঠা-১৩৬ ।
১৫। মণ্ডল কৃষ্ণকালী- সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি ভাস্কর্য। মণ্ডল কৃষ্ণকালী। সুন্দরবনের কয়েকটি মূর্তি ভাস্কর্য । প্রথম প্রকাশ- অক্টোবর, ২০১০, নব চলন্তিকা। পৃষ্ঠা- ২২৭।
১৬। Bhattacharya B.C. - The Jaina Iconography. first edition- Lahore, 1939. Second edition- Delhi, 1971. Page no- 14.
১৭। মহন্ত সুমিত- হিড়বাঁধ পরিমণ্ডলে অনালোচিত জৈন মূর্তি ও ভাস্কর্য ঃ ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে, শ্রমণ। সম্পাদিকা- ডঃ লতা বোথরা, সহ- সম্পাদক- সুখময় মাজী, কার্তিক- ১৪৩০, পৃষ্ঠা- ৫৭-৫৮।
১৮। বন্দ্যোপাধ্যায় সুকুমার- রাঢ় বাঙলায় জৈন অবশেষ – বাঁকুড়া জেলা পর্ব। প্রথম প্রকাশ – কলকাতা বইমেলা, ফেব্রুয়ারি ২০২২, আনন্দ প্রকাশন, সি-৮, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট (দ্বিতল) , কলকাতা- ৭০০০০৭, সম্পাদনা- সুশীলকুমার বর্মণ। পৃষ্ঠা- ১৩৭।
১৯। ভট্টাচার্য কণাদ- বাঁকুড়া জেলার তিন দেউলভিড়ার স্থাপত্য ও প্রত্নচর্চা, বাঁকুড়ার প্রাচীন স্থাপত্য ও প্রত্নচর্চা। সম্পাদক – কণাদ ভট্টাচার্য, শুভদীপ অধিকারী, সৌমেন রক্ষিত। প্রথম প্রকাশ – অক্টোবর, ২০২৪। প্রকাশক- অমর ভারতী, কলকাতা- ৭০০০০৯, পৃষ্ঠা- ১৪০।

ক্ষেত্রসমীক্ষা:-

প্রথম ক্ষেত্রানুসন্ধান	২২।০২।২০২৪। সঙ্গী হিমাদ্রি সিংহ, জিয়ড়দা।
দ্বিতীয় ক্ষেত্রানুসন্ধান -	২৪।০২।২০২৪।
তৃতীয় ক্ষেত্রানুসন্ধান -	২৫।০২।২০২০
চতুর্থ ক্ষেত্রানুসন্ধান -	৩১/০২/২০২০ । সঙ্গী- সমাপ্তি চক্রবর্তী, জোড়দা ।
পঞ্চম ক্ষেত্রানুসন্ধান-	২০/ ০৩/ ২০২০।

রাজা শ্রেণিক ও রানি চেলনার কথা

- সুখময় মাজী

অনেক অনেক বছর আগে, ভগবান মহাবীরের সময়ে বৈশালী নামের নগর ছিল সমৃদ্ধ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ। সেই বৈশালীর অধিপতি ছিলেন মহাশক্তিশালী রাজা চেটক। তাঁর একমাত্র কন্যা, রাজকুমারী চেলনা ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী। তিনি ছিলেন রাজ্যের গৌরব। তাঁর সৌন্দর্য ছিল যেমন অপূর্ব, তেমনি তাঁর চরিত্র ছিল শান্ত, নম্র ও আধ্যাত্মিকতায় ভরা।

সেই সময় মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন মহারাজ শ্রেণিক, যিনি ইতিহাসে বিম্বিসার নামে পরিচিত। একদিন তাঁর রাজসভায় এক বিখ্যাত চিত্রশিল্পী উপস্থিত হলেন। মহারাজ শ্রেণিককে প্রণাম করে সেই শিল্পী তাঁর নিজের হাতে আঁকা এক চিত্র রাজাকে দেখালেন। সেই চিত্রটি ছিল আসলে রাজকুমারী চেলনার প্রতিকৃতি। ছবিটি সূর্যালোকের মতো প্রদীপ্ত, জ্যোৎস্নার মতো স্নিগ্ধ; মনে হচ্ছিল যেন ছবি নয়, বরং ছবির মধ্যে স্বয়ং রাজকুমারী; জীবন্ত ও প্রাণবন্ত। এই চিত্রটি দেখে মগধের মগধের মহান সম্রাট শ্রেণিক অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি আগে কখনও এমন শান্তিময় সৌন্দর্য দেখেননি। তাঁর হৃদয়ের গভীরে এক অদ্ভুত অনুভূতি জাগল—তিনি রাজকুমারীকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

ঘটনাচক্রে এর কিছুদিন পরই রাজকুমারী চেলনা কোনো রাজকীয় কাজে মগধে এলেন। তখনই প্রথম তাঁর চোখে পড়লেন রাজা শ্রেণিক। তিনিও রাজা শ্রেণিককে দেখে মুগ্ধ হয়ে উঠলেন। আর শ্রেণিক? তিনি তো ছবি দেখার পর থেকেই রাজকুমারীকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন। ফলে দুই তরুণ হৃদয়ের মধ্যে এক অদৃশ্য সেতু তৈরি হতে সময় লাগল না। পরস্পরকে দেখে তাঁদের চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল প্রেমের দীপ্তি। স্বাভাবিকভাবেই দুই রাজপরিবারের সম্মতিতে কিছুদিনের মধ্যেই রাজকীয় আয়োজনের মাধ্যমে তাঁদের বিবাহ সম্পন্ন হয়ে গেল।

রাজা ও রানি – উভয়ের মধ্যে ছিল পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় প্রেম। কিন্তু স্বভাবের দিক থেকে তাঁরা ছিলেন একে অপরের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। চেলনা ছিলেন একান্তভাবে জৈনধর্মের অনুসারী; আর শ্রেণিক ছিলেন বৌদ্ধ শিক্ষায় প্রভাবিত। বিবাহের পরও দু'জনের স্বভাবের এই ভিন্নতায় কোনো পরিবর্তন হয় নি।

রানি চেলনা প্রতিদিন জৈন সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতেন, তাঁদের উপদেশ শুনতেন, তাঁদের থেকে অহিংসা ও সংযমের শিক্ষা গ্রহণ করতেন। রাজা শ্রেণিক দয়ালু মানুষ হলেও তিনি দিগম্বর জৈন সন্ন্যাসীদের ত্যাগ, সংযম ও কৃচ্ছসাধন সম্পর্কে সংশয়ী ছিলেন। তিনি মনে মনে ভাবতেন—এই জৈন সন্ন্যাসীরা সত্যিই কি এতটাই সংযমী? তাঁরা কি সত্যিই রাগ, দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন? নাকি সবই কেবল লোকদেখানো ভান? এই সন্দেহ ধীরে ধীরে রাজার মনে বিরক্তি সৃষ্টি করছিল। ফলে রানি চেলনার জৈন মুনিদের প্রতি এত প্রগাঢ় ভক্তি তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। রাজার এই মনোভাবের কারণে রানি চেলনা খুবই দুঃখ অনুভব করতেন। রাজা না জানলেও তিনি তো জানতেন, জৈন সন্ন্যাসীরা সত্যিই কঠোর ও আপসহীন ত্যাগ ও সংযমের পথ অনুসরণ করেন। কিন্তু কীভাবে রাজাকে তিনি তা বোঝাবেন?

একদিন রাজা শ্রেণিক অরণ্যে শিকারে বেরোলেন। বনের মধ্যে নানা রকম গাছপালা, ঝর্ঝর শব্দে বয়ে চলা ক্ষুদ্র নদী আর গভীর নীরবতার মধ্যে রাজা হঠাৎ দেখলেন—এক জৈন সাধু এক শিলার উপর গভীরভাবে ধ্যানস্থ। তাঁর দেহ স্থির, শ্বাস যেন অদৃশ্য, চারপাশে সম্পূর্ণ শান্তি। এই সাধু যমধর মুনি নামে পরিচিত ছিলেন। ধ্যানমগ্ন যমধর মুনিকে দেখেই রাজা ভাবলেন—"আজই পরীক্ষা করা যাক। আজই বুঝতে পারব, এরা সত্যিই কি সংযমী, নাকি এঁদের এই সংযমী ও শান্ত উদাসীন ভাব নিছক ভানমাত্র!"

তখন তিনি তাঁর শিকারি কুকুরগুলোকে যমধরের দিকে লেলিয়ে দিলেন। রাজার ইঙ্গিত পাওয়ামাত্রই সেই ক্ষুধার্ত ও হিংস্র কুকুরগুলো ধেয়ে গেল মুনিরাজের দিকে, কিন্তু রাজা দেখে চমকে গেলেন যে, বিস্ময়কর ভাবে সন্ন্যাসীর শান্ত, অচঞ্চল অবস্থার সামনে কুকুরগুলিও থেমে গেল। তাঁরা ক্রমে শান্ত হয়ে সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে বসে পড়ল।

এ দৃশ্য দেখেও মুনিরাজের প্রতি রাজার মনে কোনোপ্রকার ভক্তির উদ্রেক হল না। বরং তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। তিনি মনে করলেন—এ নিশ্চয়ই কোনো মায়াজাল! মুনি হয়তো কোনো জাদুর প্রভাবে কুকুরগুলিকে শান্ত করে দিয়েছেন। তাই প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি তীর ছুঁড়লেন সন্ন্যাসীর দিকে, কিন্তু সে তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো; মুনিকে স্পর্শ না করেই তীর তাঁর পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। রাজা এতে আরও রেগে গেলেন। ক্রোধের বশে তিনি একটি মৃত সাপ এনে যমধর মুনির গলায় ঝুলিয়ে দিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

প্রাসাদে ফিরে একটু বিশ্রাম নিয়ে রাজা শ্রেণিক কথাপ্রসঙ্গে এই ঘটনাটি রানিকে বললেন। ঘটনাটি শুনেই রানি চেলনার হৃদয় কেঁপে উঠল; মনের মধ্যে তিনি গভীর বেদনা অনুভব করলেন। এক মুনিরাজের সাথে এই ধরণের নিষ্ঠুর ব্যবহারের কথা জেনে তাঁর মন কেঁদে উঠল। তিনি গভীর বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে রাজাকে বললেন— "চলুন, এখনই ফিরে যাই। তিনি একজন নিরপরাধ সন্ন্যাসী। তাঁর কী অবস্থা হয়েছে জানতে হবে!"

রানীর পীড়াপীড়িতে রানীকে সাথে নিয়ে রাজা শ্রেণিক আবার সেই অরণ্যে ফিরে গেলেন। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাঁরা যা দেখলেন, তাতে উভয়েই চমকে উঠলেন। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মুনি যমধরের গলায় এখনো মৃত সাপটি ঝুলছে। সেই সাপের মাংস খাওয়ার জন্য পিঁপড়ে ও নানা কীটপতং এসে জুটেছে। তারা মুনিরাজের শরীরে হেঁটে চলেছে। মুনিরাজকেও তাঁরা দংশনে ক্ষতবিক্ষত করছে। তাঁর শরীরের ঐ সব ক্ষত থেকে রক্ত ঝরছে, কিন্তু তাঁর মন শান্ত, তাঁর ধ্যান অটুট। এই দৃশ্য এক অলোকসামান্য অতিমানবিক সহনশীলতার চিত্র।

এই বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখামাত্র রানির চোখ অশ্রুতে ভরে উঠল। তিনি রাজাকে বললেন— "দেখুন, যারা তাঁকে আঘাত করেছে, তাদের প্রতিও এই মুনি মহারাজের কোনো রাগ নেই। এ'ই হলো সত্যিকারের সংযম।" এরপর রানি পরম মমতায় নিজের হাতে সাপটি সরালেন, পিঁপড়ে ও কীটপতঙ্গগুলিকে আলতো করে সরিয়ে দিলেন এবং মুনিরাজে দেহের ক্ষতস্থানগুলি পরিষ্কার করলেন। তাঁর কপালে চন্দনের প্রলেপ লাগালেন। প্রশান্ত পরিবেশে কিছুক্ষণ পর মুনি যমধর চোখ খুললেন এবং রাজা-রানিকে সমানভাবে আশীর্বাদ করলেন।

যে রাজা তাঁর এই দুর্দশা ঘটিয়েছিলেন, সেই রাজা শ্রেণিকের প্রতি তিনি কোনোপ্রকার ক্রোধ প্রকাশ করলেন না আবার যে রানি পরম মমতায় তাঁর সেবা করলেন, সেই রানির প্রতি কোনো পক্ষপাতও করলেন না। দু'জনের মধ্যেই তিনি সমভাব দেখালেন—যে সমভাব জৈনধর্মের মূল ভিত্তি।

এই ঘটনায় রাজা শ্রেণিক স্তব্ধ হয়ে গেলেন। তিনি বুঝলেন— যে মানুষ ঘৃণা ও ব্যথা দেওয়া ব্যক্তিকেও একই দৃষ্টিতে দেখতে পারেন, চরম প্রতিকূলতার মধ্যেও যাঁর ধ্যান ভঙ্গ হয় না, যাঁর চিত্ত সুখ ও দুঃখে সমান নির্লিপ্ত থাকে— তিনি সত্যই রাগদ্বেষ থেকে মুক্ত। অতএব জৈন সাধুদের যে সংযম, তা যথার্থই সংযমের চূড়ান্ত রূপ। এই উপলব্ধি হওয়ার পর রাজা শ্রেণিক রানি

চেলনার সঙ্গেই জৈনধর্মের পথে নিজেকে সমর্পণ করলেন এবং ভগবান মহাবীরকে শ্রদ্ধা জানালেন। পরবর্তীকালে রাজা শ্রেণিক নিজেকে জৈন ধর্মের এক প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছিলেন।

এই কাহিনী আমাদের জন্য যে বার্তা দেয়, তা হল, যে নিজে তপস্যা করতে পারে না, অন্যের ত্যাগ ও সংযম নিয়ে সন্দেহ করা তার উচিত নয়। যারা প্রকৃত অর্থে ধর্মনিষ্ঠ ও সংযমী—তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতে হয়। তাঁদের কষ্ট দিলে পাপকর্মের বৃদ্ধি হয়, আর তাঁদের সেবা করলে পুণ্যকর্মের বৃদ্ধি হয় এবং একই সাথে নির্জরাও ঘটে থাকে। আসলে অন্যের গুণকে গ্রহণ করা ও প্রশংসা করা—মানুষের মনুষ্যত্বের আসল পরিচায়ক।